পরম রতন

সমরেশ বসু

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : গোপালচন্দ্র পাল : স্টার প্রিন্টিং প্রেস

১১/এ, রাধানাথ বোস লেন : কলিকাতা—৬

পরম রতন

যার জীবনের কথা আমি বলতে যাচ্ছি, সে আমার এক বন্ধু। সে আমার থেকে দু-চার বছর বয়সের বড় হতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্ববোধ গঠিত হতে আটকায় নি। শুধু বয়সের কথাই বা বলছি কেন। বন্ধু বলতে আমরা এমন সব ব্যক্তির কথাই সচরাচর উল্লেখ করে থাকি, যাদের সঙ্গে আমাদের মানসিক গঠন, চরিত্রগত মিল এবং পরিবেশগত মিশ্রতা কোথাও থাকে। কথাটা আমি সর্বাংশে মেনে নিতে পারি না। আমার অভিজ্ঞতা বলে, অনেক বিপরীতের সঙ্গেও রীতিপ্রকরণ ঘটে যায়। অমিলের সঙ্গে মিল মিশ খেয়ে যায়। আর সত্যি কথা বলতে কি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'কনট্রাস্ট'—মূল ছবিটা তাতেই তো জমে ভালো। শুধু সমতলের থেকে, ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতা এবং বিভিন্ন বর্ণাঢ্যতা দৃষ্টিকে বিস্মিত ও খুশী করে। কিন্তু কোনো অস্বাভাবিকতা বোধ মনে জাগে না। এটা মানুষের রূপের ক্ষেত্রেও বলা যায়। পৃথিবীর কোনো কোনো সীমিত অংশের মানুষের কথা বলা যায়, সব মহিলা পুরুষকে দেখলেই একরকম মনে হয়। বুঝতে পারা যায়, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে, এই সব অংশে বড় রকমের ঘটনা তেমন ঘটে নি। ঘটলে, আমরা যাকে নৃ-তত্ত্ব বলি, সে একটা বিপ্লব না ঘটিয়ে ছাড়তো না। নাসা কপাল কপোল করোটি চক্ষু, সব কিছুর মধ্যেই একটা ভাঙচুর ঘটে যেত। সেই কারণে, প্রায় এক ধরনের চোখ মুখ চেহারা বর্ণ-মানুষদের নিয়ে, আমি তো বেশ অস্বস্তি বোধ করি। তারপরেও আসে চরিত্রের কথা। আচরণের কথা তো তার মধ্যে আছেই।

প্রকৃতির কি পরম আশীর্বাদ, আমাদের রূপ ও চরিত্রের মধ্যে নানা বিভিন্নতা আছে। মানুষ যদি মৌমাছিদের মতো পতঙ্গ হত, চিন্তা করতেও আতঙ্ক হয়। প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েও, পতঙ্গরা দৃশ্যতঃ অবিকল, যান্ত্রিক না। মানুষও যদি সেই রকম হতো, তাহলে আর মানুষকে বোধহয় মানুষ বলা যেত না। অন্য কোনো জীব বা পতঙ্গ বলা যেতে পারতো। তার সঙ্গে মানুষের কতগুলো মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে চরিত্রে এবং আচরণে এক হত, তাহলে মনে করতে হত, মানুষ যন্ত্রের ছাঁচে ফেলা এক ধরনের জীব। তারাও মধুচক্রের মৌমাছি মাত্র। একটি মক্ষীরাণীর জন্য কেবল মধু সঞ্চয়ই যার জীবনের সার কথা। অবিশ্যি এরকম মৌচাক সমাজ গঠনের চেষ্টাও যে পৃথিবীর কোথাও কোথাও না ঘটেছে, তা নয়। সকলের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যকে এক ছাঁচে ঢালাই করে সমাজে একটা

সমতা আনার শুভ প্রচেষ্টা। কিন্তু এত বড় ভয়ংকর অশুভ ঘটনা এখনো কোথাও ঘটে উঠতে পারে নি। অনেক চেষ্টাতেও না। যদিও কথায় বলা হয়, আর্থিক সমতা, কিন্তু দেখা গিয়েছে, মানুষের গুণগত দিকগুলোকেও একটা ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা হয়েছে, হচ্ছে, হবে। মানুষ যে অপরাজিত, তার প্রমাণ এ রকম দুর্ঘটনা এখনো ঘটে উঠতে পারে নি। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ, যে কোনো ধরনের শাসক শক্তিই, তাদের প্রয়োজনে একটি মৌমাছিতন্ত্র রচনা করতে চায়। সেই হিসাবে দেখলে কোটি কোটি মানুষ চিরদিনই একদিক থেকে দুঃখী এবং অসহায়। তখন মনে হয়, মানুষের বিদ্রোহ তার স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যেই। তার জন্য আঘাত সইতে হলেও, এটাই বোধহয় সত্য।

যাই হোক, সামান্য একটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক বিতর্কিত কথা এসে পড়ছে। ধান ভানতে গিয়ে অনেকটা শিবের গীতের মতো হয়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য ছিল, অনেক সময় প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যক্তির সঙ্গেও এক এক জনের বিস্ময়কর রকমের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়।

এ বিষয়ে, নাম ধাম গোপন রেখে, নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমেই আমি একটি চরিত্রের কথা বলছি। যে-চরিত্র অবিশ্যিই এ উপন্যাসের চরিত্র নন। বেশ কিছুকাল আগের কথা, আমার একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যে কাহিনীর পটভূমি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী, এবং প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। কলকাতা-কেন্দ্রিক না। সেই উপন্যাসে হুগলী জেলার একটি গ্রাম তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। উপন্যাস প্রকাশের কিছুদিন পরেই, এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তিনি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। বলা বাহুল্য, সেই উপন্যাসটি পড়ে তাঁর খুবই ভালো লেগেছে এবং সেই বিষয়েই তিনি আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।

ভদ্রলোককে আমি আমন্ত্রণ জানালাম এবং ধরেই নিলাম, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোনো যুবক। হয়তো সাহিত্য যশোপ্রার্থীও হতে পারেন। অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখা গিয়েছে, সাধারণতঃ এ ধরনের পাঠকের সাক্ষাৎই বেশী ঘটে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক যখন এলেন, দেখলাম তিনি প্রায় আমার পিতৃবয়সী। তখনই তাঁর ষাটের ওপর বয়স। ধুতি পাঞ্জাবি হাতে লাঠি নিয়ে ভদ্রলোক আমার বাড়ি এলেন, প্রায় চিৎকার করে, পাড়া মাথায় করে। এসেছিলেন দুপুরের দিকে, বাড়িতে তখন সকলেই একটু দিবানিদ্রার সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু ভদ্রলোকের চিৎকার করে কথাবার্তা বলায় সকলেরই দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটেছিল। সত্যি বলতে কি, আমিও কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছিলাম। ভর দুপুরে, এ আবার কী ঝামেলা এসে জুটলো! আমার বিরক্তব্যঞ্জক চিন্তাটা প্রায় এই রকমের। ভদ্রলোকের তো

আসার কথা বিকাল চারটে সাড়ে চারটের সময়। এলেন বেলা দুটোয় এবং সেটাই গলার স্বর সপ্তগ্রামে তুলে জানালেন, তিনি আর কিছুতেই বিকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না। আমার কাছে আসবার জন্য তাঁর নাকি মন বড় ছটফট করছিল। বিশেষ করে তিনি যে আবার দিনের বেলা ঘুমোতে পারেন না। হাঁপের টান আছে। বায়ু-পিত্তের আধিক্যও আছে। দিনের বেলা দূরের কথা, রাত্রেই মোটে ঘুমোতে পারেন না। তাছাড়া, দিনের বেলা ঘুমোবেনই বা কী করে। ইস্কুল মাস্টারের জীবন যে! ছেলেদের সঙ্গে হাঁকে ডাকেই যে কেটে যায়।

ভাবলাম কী আমার দুর্ভাগ্য! এমন নির্জন নিদাঘ প্রহরে। আমার একজন সুবেশা সুরসিকা প্রিয় পাঠিকাও তো আসতে পারতেন। তার পরিবর্তে কী না এমন একটি বাজখাঁই গলার বৃদ্ধ ইস্কুল মাস্টার। হাতে যাঁর মোটা একখানি লাঠি। এই সব ব্যক্তিদের আমি বরাবর বড় ভয় পাই। সেজন্য ছেলেবেলা থেকে কোনোরকমে পাঠশালার চৌকাট ডিঙোতে পেরেছিলাম। আর ওমুখো হই নি। অভিভাবকদের শত চেষ্টাতেও।

ভদ্রলোক দেখতে অবিশ্যি শীর্ণ। কিন্তু চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। যেন প্রতি মুহূর্তেই নানা চিন্তার ঝিলিকে ঝলক দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কৌতূহলের মাত্রাটাও টের পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখলে একটু ক্ষ্যাপাটে ভাবের মনে হতে পারে। সেই বয়সে এবং পোশাকে যেটা লক্ষণীয়, ভদ্রলোকের চোখে চশমা ছিল না। কিন্তু এত চিৎকার করে কথা বলেন কেন? তিনি নিজেই তাঁর নাম ঘোষণা করে দুপুরে আসার কৈফিয়ৎ ইত্যাদি দিয়েছিলেন। মনে যা-ই থাক, আমি তাঁকে আপ্যায়ন করে বসিয়েছিলাম, এবং বলেছিলাম, 'তা এসে পড়েছেন, কী করা যাবে। বসুন, কথা বলা যাক।'

আমার এই কথার জবাবে ভদ্রলোক তখনই লাঠি সমেত তাঁর হাত তুলে বলে উঠেছিলেন, 'চা খাওয়া যাক? না না না, আমি ওসব চা ফা খাই না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন।'

চা? চায়ের প্রসঙ্গ এল কোথা থেকে? আমি তো চা খাবার কথা একবারও বলিনি। তবু তাঁর কথারই মাত্রা ধরে বললাম, 'তাহলে এক গ্লাস জল খান।'

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে বললেন, 'বলব বলব, বলব বলেই তো এসেছি। তা না হলে কি আর এভাবে ছুটে আসি?'

অবাক লাগছিল। দু জনের কথাবার্তার প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছিল না। থাকবে কেমন করে। দু চার কথার পরেই ভদ্রলোক নিজেই চিৎকার করে জানিয়েছিলেন, তিনি কানে একটু খাটো আছেন। অতএব

সকলেই কানে খাটো, সেইজন্যই তো তিনি চিৎকার করে কথা বলছিলেন। কী আমার ভাগ্য! ভর দুপুরে একজন প্রিয় পাঠক ছুটে এলেন, যাঁর সঙ্গে কোনো দিক থেকে আমার কোথাও মিল নেই, মিলতেও পারে না। দুজনের বয়সের ব্যবধান তো প্রায় তিরিশের কাছাকাছি।

কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি যে প্রায় আমার বন্ধুর পর্যায়ে চলে আসতে পারেন, কখনো ভাবতে পারি নি। ভাবার দরকারও হয় নি। আপনা থেকেই, দিনের পর দিন, নানা কথা ও ঘটনার মধ্য দিয়ে তা গড়ে উঠেছিল। আমি কোনো ঘটনার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু সেই কানে-খাটো ষাট বছরের বৃদ্ধ, যাঁর হাতে লাঠি, ইস্কুলের শিক্ষক, তিনি যে আসলে একটি তরুণ, অথচ সারা জীবন ধরে বঞ্চনার মধ্য দিয়েও, ভিতরে একটি চোখের জলে গলানো অনির্বচনীয় হাসি প্রাণে মাখিয়ে রেখেছেন, সেই পরিচয়টা ধীরে ধীরে পেয়েছিলাম। তিনি কতখানি রসিক ও ভাবুক বা কল্পনাপ্রয়াসী, সেসব প্রসঙ্গও আমি তুলতে চাইছি না। আমার সেই উপন্যাসের পটভূমি গ্রামে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও উপন্যাস লেখবার আগেই আমি সেই গ্রাম ঘুরে এসেছিলাম, তার সম্পর্কে খবরা-খবর এবং কিছু পড়াশোনা করেছিলাম। ভদ্রলোকের সেইটি হ'ল জন্মভূমিগ্রাম। তাঁর ছেলেবেলার গোকুল হয়তো যৌবনের কিছু অপাপ-লিখিত বৃন্দাবন লীলাস্থল। তাঁরা কলকাতাবাসী হলেও, সেই গ্রামে তখনো তাঁদের প্রাচীন চক-মেলানো বিরাট বসতবাটি ছিল। লোকজন প্রায় ছিলই না। নিতান্ত দু-একজন আত্মীয় ও তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল।

ঝিঁঝি নিস্বন ঘোর দুপুরে, রাত্রের নিশিতে তিনি আমাকে নিয়ে তাঁদের সেই গ্রামের পথে মাঠে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর নিজে থেকেই আমার উপন্যাসের চরিত্রের নাম করে বলেছেন, 'আপনার নায়িকার সঙ্গে নায়কের ঠিক এখানটাতেই প্রথম দেখা হয়েছিল, বলুন সত্যি কী না?'...অথবা বলেছেন, 'এই তো, এই তো সেই রথ টানার মাঠ, যেখানে নায়িকার বাবা চলন্ত রথের তলায় আত্মাহুতি দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বলুন, ঠিক বলিনি?' তারপরে একদিন রাত্রে, ফিকা জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই তো সেই নদীর উঁচু পাড়, এখানেই তো সেই পরম বিচ্ছেদ, একজন আত্মহত্যা করল জলে ডুবে, আর একজন অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল নদীর পাড়ে। আর তখন চিতা বাঘের মতন আর একজন সেই ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করছিল। বলুন বলুন, এসবই আমি সত্যি বলছি কি না?'...

এসব কথা বলতে বলতেই, তাঁকে কখনো হেসে উঠতে দেখেছি, উত্তেজিত হতে দেখেছি, আবার শিশুর মতো কেঁদে উঠতেও দেখেছি।

তারপরে একটু একটু করে শুনেছি তাঁর নিষ্করুণ হাহাকার ভরা জীবন-বৃত্তান্ত, যা পাপ ও পুণ্যের মাঝখানে আবর্তিত হয়েছিল। তাঁর সেই জীবনবৃত্তান্তের স্বীকারোক্তিই তাঁকে আমার ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। তিনি আমার এমন জায়গায় স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, বয়সের অসমতা ভুলে গিয়ে অনেক সময় আমিও আমার জীবনের অনেক কথা তাঁকে বলেছি। তখন আমাদের বয়স বা চরিত্র বা আচরণগত অমিলগুলো কোন বাধা হিসাবেই আসেনি।

যেখানে হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে, সেখানে কোনো বাধাই বাধা নয়, এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম।

আপাততঃ যার কথা বলতে যাচ্ছি, তার কথাই বলি। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে বয়সের সেরকম অসমতা নেই। তবে বৈপরীত্য অনেক। তাঁর জীবনের সব কথাই আমি জানি বা বলতে পারবো, তাও সত্যি না। তবে অনেক সময়েই সামান্য সরোবরে আকাশের বিশাল ছায়া পড়তে দেখা যায়। তা থেকে একটি প্রকৃতির নির্দেশ পাওয়া যায়। সেরকম কিছু ঘটনাই আমি বলব, যা আমার চোখের দেখার সরোবরে ছায়া ফেলেছিল। জানি না, অসীম আকাশের কতোখানি সেখানে প্রতিবিম্বিত হবে।

আপাততঃ যেসব কথা বা যার কথা, আমার নিজের জবানীতে বলছি, পরে আর তার দরকার হবে না। আসল চরিত্র নিজেই তার জীবনকথার কথক হয়ে উঠবে। আমি তখন কেবল শ্রোতা। বস্তুতপক্ষে আমি যার কথা বলতে যাচ্ছি, সে যে আমার সঙ্গে রাস্তাঘাটে হঠাৎ পরিচিত, তা না। একদিক থেকে বলতে গেলে, তাকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। তবে চেনা পর্যন্তই। আলাপ পরিচয় কিছু ঘটেনি। চেহারাটা দেখা ছিল। বলিষ্ঠ ঋজু দীর্ঘ শরীর। বাইরের থেকে মেদের ভাঁজও টের পাওয়া যায় না। দু চার বার যা দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পোশাকেই দেখেছি। কখনো ধুতি পাঞ্জাবি, কখনো ট্রাউজার শার্ট, কখনো বা যাকে বলে একেবারে স্যুটেড বুটেড কণ্ঠলেঙুটিসহ, কেতাদুরস্ত সাহেব। হেঁটে চলাফেরা কমই। তার একাধিক গাড়ি আছে। ড্রাইভার তো আছে, নিজেও গাড়ি ড্রাইভ করে, এবং যে দু একবার তাকে আমি গাড়ি ড্রাইভ করতে দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, বেশ পাকাপোক্ত সিদ্ধহস্ত চালক, এবং সম্ভবতঃ কিছুটা দুঃসাহসীও। কখনো কখনো বিপজ্জনকও বলা যায়। আমার নিজের চোখেই দু একবার যেভাবে গাড়ি চালাতে দেখেছি, শক্ত হয়ে সিটিয়ে গিয়েছি। চোখ বুজে ফেলেছি, কারণ ধরেই নিয়েছি, চোখ খুলেই

একটা বীভৎস মর্মান্তিক দৃশ্য কিছু দেখতে হবে। বিশেষ করে, আরো এই কারণে চোখ বুজেই, রাস্তায় একাধিক গাড়ির তীব্র হর্ণ এবং ব্রেক কষার জান্তব শব্দ এবং সেই সঙ্গে লোকের গেল গেল চিৎকারও কানে শুনেছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যার বেরিয়ে চলে যাবার সে ঠিকই চলে গিয়েছে। এ ধরনের লোকদের নিয়ে আমার ভাবতে ভালো লাগে না। মেশবার তো কোনো প্রশ্নই নেই। এসব ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা আচার আচরণ আমি কিছুই বুঝি না। বুঝতে চাইও নি। ভুলে থাকতেই চেয়েছি।

যার কথা বলছি, তার নামটা এখানেই জানিয়ে রাখা ভালো। নাম ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র। মুখোমুখি আলাপ পরিচয়ের আগেও ধূর্জটিপ্রসাদকে আমার চিনতে পারার একমাত্র কারণ, সে আমার পাড়ার কাছেই থাকে। আমি যে রাস্তায় থাকি (অবিশ্যিই কলকাতায়) সে থাকে ঠিক পাশের আর একটি রাস্তায়। এক সময়ে সে নাকি আমার মেজদার সঙ্গে ইস্কুল কলেজে পড়েছে। সেই হিসাবে, তাকে আমার মেজদার বন্ধু বলা যায়। যদিও আমার থেকে সামান্য বড়, মেজদার সঙ্গে ধূর্জটিকে আমি কখনো তেমন মেলামেশা করতে দেখিনি। আমার মেজদাকেও আমি কখনো ধূর্জটির সম্পর্কে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে কোনো কথা বলতে শুনিনি। পরবর্তী জীবনে মেজদার সঙ্গে ধূর্জটির আর কোনো সম্পর্কও ছিল না। এখন তো নেই-ই। মেজদা পাকাপাকিভাবেই উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বলতে গেলে আমাদের বংশের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ উত্তর ভারতেই স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। মেজদা সেখানেই বাড়ি করেছে, প্রবাসী বাঙালী মেয়ে বিয়ে করেছে, এবং নিজের কন্যাটিকেও অত্যন্ত অল্প বয়সে প্রবাসী বাঙালী পাত্রেই পাত্রস্থ করেছে।

যাই হোক, এসব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। আমার সঙ্গে যে ধূর্জটি মিত্রের পূর্বে কখনো, (এখন থেকে বেশ কিছু বছর আগের কথা বলছি) আলাপ পরিচয় হয়নি, তার হেতু ধরে নেওয়া যায়, কোনো দিক থেকেই যোগাযোগের কোনো প্রশ্ন ছিল না। আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায়, বিশেষ করে শহরে নগরে। সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও আমরা অনেকে অনেকের খোঁজ রাখি না। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে অপরিচয় থেকে যায়। ধূর্জটি মিত্রের ক্ষেত্রেও সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

প্রথমতঃ আমার মতো লোক যাদের বড়লোক মনে করে, ধূর্জটি অর্থের ক্ষেত্রে তা-ই। সে আমার থেকে বেশ বড়লোক। তার সব নানা ধরনের ব্যবসা আছে, আমি সে সবের কিছুই জানি না। শুনেছিলাম, সে খুব ব্যস্ত মানুষ, বহু লোক নিয়ে তার কাজ কারবার। সেই হিসাবে আমার জগৎটা সম্পূর্ণই আলাদা। জীবিকার ক্ষেত্রে আমাকেও নিশ্চয়ই

ব্যবসায়ী বলতে হবে। আমার গদীর বেদীতে যে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তিনি চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এখানে অনেকখানিই সেই ফুলের মালাগাছি বিকোবার ব্যাপার। পছন্দ অপছন্দ দূরের কথা, অনেকে নেড়ে চেড়েও পরখ করতে চাইবে না হয়তো। অনুগ্রহ করে তাও যদি করে, তবে হয়তো দেখা যাবে আমার গাঁথা মালা ক্রেতার বিদ্রূপ আর বিরক্তিই লাভ করেছে। অর্থাৎ এইটুকু কেবল বলতে চাইছিলাম, আমার জীবিকার ক্ষেত্রে যা সৃষ্টি, তা মানুষের নিতান্ত বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কোনো দরকারই নেই। আমার সৃষ্টির লক্ষ্য, মানুষের মন ও হৃদয়। ও বস্তুগুলো নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরাই জানেন, স্নেহ মেলে লাখে এক। ধূর্জটিপ্রসাদ সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সঠিক যদিও তখন জানা ছিল না, তার ব্যবসায়ের বস্তুগত বিষয় গুণাগুণ কী, তবে সন্দেহ ছিল না, সমাজের মানুষের প্রত্যহের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা অপরিহার্য। অন্যথায় অনেক লোক এবং বহু ব্যস্ততার প্রয়োজন ছিল না। সরকারী আমলা কামলা মন্ত্রীতন্ত্রী ধারক বাহক সকলের সঙ্গেই তার বিশেষ ওঠাবসা জানাশোনা। জানি না, সবই তার ব্যবসার অন্তর্গত কী না। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ধূর্জটিপ্রসাদের কম না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ আজকাল আমরা যাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বলি। অমুক পাড়ার শ্রী অমুক ব্যক্তি কেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত, এবং সর্বদাই তার নাম গোচরীভূত হয়, তার মূল কারণগুলো সকলেই জানে। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি যথেষ্ট ধনী হওয়া উচিত, কিন্তু তার ধনগৌরব নিস্তরঙ্গ স্রোতের নিঃশব্দ টানে প্রবাহিত হলে হবে না। শহরের সর্বত্র তা ভাইব্রেট—অর্থাৎ প্রতিধ্বনিত হওয়া চাই। যদি সে তেমন ধনী ব্যক্তি নাও হয়, তথাপি যে কোনো সময়ে, যে কোনো সংখ্যার অর্থ সে যে ভাবেই হোক সংগ্রহ করতে সক্ষম, এবং ধূলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে। এই গুণাবলী ছাড়াও, শ্রীকৃষ্ণের শতনামের মতো এদের শত গুণাবলীর বিষয় বলা যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মতো এই সব ব্যক্তিরা পাড়ার সর্ববিষয়ে প্রথমেই স্মর্তব্য। দিন শুরুর প্রথম স্তব-গানেই এই সব ব্যক্তির নাম উচ্চারিত। জনসেবা-রক্ষা-খতম-গ্রহণ-বর্জন-বিতাড়ন, সমাজ শাসন-স্নেহ-সাম্য, উৎস-পার্বণ-পূজা-উল্লাস-উচ্ছৃংখলতা-উৎখাত, সকল বিষয়েই এই সব ব্যক্তির ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না।

আজকের সমাজে যাদের 'কেষ্টবিষ্টু' বলে, জানি না এগুলো তাদেরই চরিত্রগত লক্ষণ কি না। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, (ধূর্জটির সঙ্গে সম্যক এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগে।) ধূর্জটিপ্রসাদ এইসব আলো

আঁধারের গুণাধারে কতোখানি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার কোনো 'ডিটেল' আমার জানা ছিল না। আমার নিজের পাড়ায় যে কয়জন স্বল্প ব্যক্তির সংগে আমার জানা-শোনা, নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, তাদের মুখ থেকে শুনে মনে হয়েছে, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রায় একটি 'কেষ্টবিষ্টু' গোছরেই লোক। অমন একজন মুরুব্বি পেলে নাকি অনেক পাড়ার বাসিন্দারাই একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, এবং মুরুব্বি গৌরবে নিজেরাও গৌরব বোধ করতে পারতেন।

আমার আবার এসব বোধাবোধ কিছু কম। মহাভারতের নায়কের মতো বলতে পারবো না স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ, পরধর্মে...ইত্যাদি, তথাপি এটুকু বলতে পারি, জীবনের এমন একটি পথকে আশ্রয় করে চলেছি, যেখানে 'কেষ্টবিষ্টু' দূরের কথা, সমাজ সংসারের এই নিরন্তর আবর্তনের ভিতর দিয়ে এই মন্ত্রেরই জপ করে চলেছি—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।' সংসারের কেউ কারোকে বুঝবে না, এমন অহংকার আমার নেই, তবু একথা সত্যি, ক'জনের বুক ভাঙা চোখের জলের গলন, ক'জনে আজ অবধি দেখতে পেয়েছে। কারণ সংসারের সব চোখের অশ্রু কখনোই সকলের চোখের সামনে গলেনি। শুধু কান্নাই বা কেন, মানুষের ক্রোধ ঘৃণা প্রেম প্রীতি স্নেহ অন্তর্দাহ দুঃখ, সবই বড় একলার। মানুষ বড় একলা। স্থূল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সে বৃহত্তর সমাজ-গোষ্ঠী বেঁধে বাঁচতে চায়। এ যেমন সত্যি, তেমনি তার নিজের একটি জগৎ থাকে, যেখানে সে একক। ভাগ দেবার কেউ নেই, নেবারও কেউ নেই।

কিন্তু সামান্য কথা বলতে গিয়ে, এসব প্রসংগ না তুলে মন্তব্য না করলেও চলে। বলতে চেয়েছিলাম, পাড়ার মুরুব্বি দূরের কথা, আমি আমার জগতের মধ্যে আপন সুখে দুখেই প্রবাহিত। তা বলে আমি তো একজন নিমজ্জিত ব্যক্তি না। সমাজের সংগে আমারও সম্পর্ক আছে, সকলের সংগে কথাবার্তাও বলি। অসহযোগিতা বলতে কিছু নেই। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের মতো ব্যক্তির সংগে নিজের যোগাযোগের কথা কখনো ভাবিনি। কল্পনাতেও আসেনি। পর্বতপ্রমাণ অমিলের মধ্যে, কখনো তা মনেও হয়নি।

তবু একটা কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। আর সে কথাটা এখনই বলে রাখা ভালো। এই যে ধূর্জটিপ্রসাদ যার কথা আমি এতখানি বললাম, যার সংগে পাশাপাশি পাড়ায় থেকেও কখনো মুখোমুখি আলাপ পরিচয় আগে হয়নি, হঠাৎ দমকা অচেনা অস্পষ্ট দিকচিহ্নহীন বাতাসের মতো যার কথা আমার কানে এসেছে, আকস্মিকভাবে নিজেই আবিষ্কার

করেছি, আমার একলা ঘরের নিরালা কোণে কখন থেকে যেন সেই লোকটির বিষয় আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি। ভাবতে আরম্ভ করেছি বললে ভুল হবে, ব্যক্তিটির বিষয়ে নানান প্রশ্ন, কখন থেকে যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে, যার কোনো জবাবই আমার জানা নেই।

এ কি আবার আমার কোনো অবচেতনের ব্যাপার নাকি? অবচেতন? সে তো পলি মাটির মতো। জোয়ারে আসে পলি ছড়িয়ে ভাঁটায় জল নেমে যায়। মূল ভূমির কোথাও কতো কী চাপা পড়ে থাকে, ঢাকা পড়ে থাকে। কোনো সূর্যচ্ছটাতেও তো পৃথিবীর বুকে প্রকাশ পায় না। আপাতঃদৃষ্টিতে কেবল সূর্যচ্ছটায় চকচকে পলি মাটি চরে, পাখীদের ভোজের আসরের ছবি ফুটে ওঠে। পলি মাটির স্তরে স্তরে পড়ে থাকে কতো কালের কতো পুজোর ফুল, কতো মানত মানসের উপচার, কতো চোখের জল, কতো অপরূপ হাসি, কতো মুখাগ্নির শেষ বিদায়ের সেই দগ্ধচিহ্ন যষ্টি।

নিজেরই অবাক লাগে, ধূর্জটিপ্রসাদ কখন কবে থেকে আমার মনে নানান জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছিল? কিংবা এটাই হয়তো স্বাভাবিক, আমরা সাধারণভাবে তলিয়ে বা ব্যাখ্যা করে দেখি না, বাইরে থেকে যা কিছু দেখা যায় না, তা আমাদের অন্তর্স্রোতে নিয়ত প্রবাহমান। আমরা নিজেরাও তা জানতে পারি না। যখন জানতে পারি, অবাক হই, এবং জবাবের সন্ধান করি, তখনই আমি আর সকলের থেকে আলাদা হয়ে পড়ি।

এ কথাটাকেও কি ব্যাখ্যা করব? আমার নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা না। ধরা যাক, একটা লোক, সকালে ঘুম ভাঙে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্নানান্তে মন্দিরে ঢোকে, ঘণ্টা বাজায়, ফুল দেয়, চলে যায় আপন কাজে। অভ্যাসের বশে, একেবারে নিজের প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে সব কি সাঙ্গ করে? সে নিজেও জানে না, সারাদিন সে কি করেছে। সে এই জেনেই তৃপ্ত, তার যা করবার, সে সবই করেছে।

আর একটি মানুষকে দেখা গেল, ঘুম ভেঙে সকাল থেকেই সে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কর্মে, গল্পে, স্বার্থে, কোথাও তার কোনো গাফিলতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না, অথচ তার মনটা বারেবারেই বিমর্ষ হয়ে উঠছে। একটা বিষণ্ণ চমকে প্রাণটা স্থির থাকতে চাইছে না। কেবলই তার মনে হতে থাকে, সুখ ভোগ কর্ম স্বার্থ সবই ঠিক চলেছে, তবু তার মধ্যে কী যেন কী হয়নি, কী যেন কী ঘটেনি, কী পাইনি। চিত্ত বিক্ষিপ্ত, অতৃপ্ত।

তারপরে এক সময়ে তন্দ্রার ঘোরে সহসাই হয়তো তার মনে পড়ে গেল, 'আজ যে আমি ঘণ্টা বাজাইনি! যে-ধ্বনির মধ্য দিয়ে দিনান্তে একবার আমি যোগাযোগ করি, সেখান থেকে বাইরে পড়ে আছি।'...জানি না,

সেই ধ্বনির সংকেতে যার সঙ্গে এই ব্যক্তির যোগাযোগ ঘটে, সে নিজেও সেই বিশেষ ঘণ্টাধ্বনিটির জন্যই সারাটা দিন উৎকর্ণ হয়ে থাকে কি না।

একটা চেতনা বাইরের, সেটা অভ্যাসের। আর একটা ভিতরের। একজনের নিত্যকর্ম। আর একজনের নিত্যের মধ্যে একটি অনিত্যের ধ্বনি, সে যতক্ষণ না হৃদয়ের দুয়ারে বাজে, ততক্ষণ তার সব কিছুতেই গরমিল, হাজার মিলের মধ্যেও।

এসব কথা থাক। এমন যে ধূর্জটিপ্রসাদ. যার সঙ্গে আমার কোথাও কোনো মিল নেই, অবাক হয়ে আমি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে শুনেছি. 'মানুষটি কি সুখী?' সুখ দুঃখ সবই অবিশ্যি আপেক্ষিক। তা মেনে নিয়েও আমার মনে হঠাৎ হঠাৎ প্রশ্ন জেগেছে, 'ধূর্জটিপ্রসাদ লোকটি সুখী?' নিজের জবাবটা নিজের কাছেই নেতিবাচক মনে হলেও জবাবটা যেন এ কথাই বলতে চেয়েছে, এসব ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের জগতে দেবরাজ ইন্দ্রের মতোই সুখী। তারপরেই আবার মনে প্রশ্ন জেগেছে। শুনেছি ধূর্জটিপ্রসাদ বিবাহিত। তার দাম্পত্যজীবন কেমন? কেন এ জিজ্ঞাসা আমার মনে এসেছিল, তার কোনো কৈফিয়ৎ আমার নিজেরই জানা নেই। তথাপি এসেছিল, এবং বলতে গেলে কোনো সন্তুষ্টজনক জবাবই পাইনি। সব প্রতিপত্তিশালী ধনী স্বামীর গৃহিণীরাই হয়তো সুখী হন না। আবার হয়ও, এমনো অনেক দেখা গিয়েছে। কে যে কিসে সুখী, আমরা তো তা সব জানি না। আবার সেই আপেক্ষিকতার কথাই আসে।

কিন্তু আমার মনে এসব প্রশ্ন উত্থাপিতই বা হয়েছিল কেন! তাহলে আমাকে একথাও স্বীকার করে নিতেই হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ আমাকে কোনো-না-কোনোভাবে ভাবিয়েছিল। সেটা অবচেতনের অন্ধকারের আবর্তনও হতে পারে। অথবা, অজানা সম্পর্কে একটা সাধারণ কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই না। তার কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল কি না, আমার জানা ছিল না। থাকলে, তারা কেমন, পিতা হিসাবে সে-ই বা কেমন? যতোটুকু দেখেছি, বুঝেছি, ধূর্জটিপ্রসাদ তার ব্যক্তিত্বকে কোনো রকমেই বিন্দুমাত্র খাটো করতে রাজী না। বরং যাদের আমরা 'এগোয়িস্টিক' বলে থাকি, সেরকম হবারই কথা। তার নৈতিক চরিত্র বিষয়েও ভালো কথা বিশেষ শোনা যায় না। আর তাও, টেপা ঠোঁটের কোণে হাসি গোপন করে বলার মতো কিছু না। সকলেই বিক্ষোভে এবং বিদ্রূপে সোচ্চার।

ধূর্জটিপ্রসাদ কি কারোকে ভালবাসে?

এ প্রশ্নটার কোনো অর্থই হয় না। সে হয়তো তার স্ত্রীকেই ভালবাসে এবং স্ত্রীটি প্রকৃতই প্রেমবতী, সার্থক স্বামীসোহাগিনী। তবু আমার মনে প্রশ্নটা জেগেছিল। জাগবার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। ওর বিষয়ে

নানারকম কথা শোনা ছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ কি কাঁদে? এখন কি তার জীবনে এমন দিন আসে, যখন সে একলা ঘরে অঝোরে কাঁদছে?

এসব একদিক থেকে বাতুলের মতোই প্রশ্ন। যদিও নিজেকে আমি সত্যি বাতুল বলে মনে করি না। এ-সবই হচ্ছে অনেকটা অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো। ঝড় ঝঞ্ঝা ভূমিকম্প বন্যা, যাই হোক এবং পৃথিবী তার জন্য নিজেকে যতোই বাতুল মনে করুক, তথাপি সে আসে। আমার মনেও তেমনি করেই এসব জিজ্ঞাসা এসেছিল। বোধহয় সেখানেই আমি আর সকলের থেকে আলাদা, মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং স্বভাবতঃই কোনো জবাবই পাই নি। অবিশ্যি এ কথাও সত্যি, এসব প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, আবার আপনা থেকেই ভুলে গিয়েছি। তা পলি-মাটিতেই চাপা পড়ে থাক্, অথবা স্তব্ধ সমুদ্রের মতোই নিশ্চুপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এসব জিজ্ঞাসা বা ভাবনা কখনোই স্পণ্টেনিয়াস্‌লি আমাকে ঘিরে ধরে নি। ধূর্জটিপ্রসাদের সহসা সাক্ষাৎ, হঠাৎ ওর বিষয়ে দু-একটি কথা বা সংবাদের মতোই, জেগেছে, ডুবে গিয়েছে। তবে লোকটির বিষয়ে মনে যে দু চারবার এরকম জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম অনেকের বিষয়েই আমার মনে চিন্তা বা জিজ্ঞাসা জাগে বা ডোবে। কতোটুকুই বা জবাব মেলে। আসলে এ সবই তো নিজের মনকে নিয়েই নাড়াচাড়া। নিজের ভিতরে যা অনুভূতিগুলো নিরন্তর বহে চলেছে, তারাই আবার অপরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। সত্যি বলতে গেলে, এ একরকমের নিজেকেই চেনা এবং জানা। নিজের মধ্যে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, অপরের বিষয়ে চির অন্ধ ও মৌন। তার যতোই দৃষ্টি আর বাক্য থাকুক।

যাই হোক, ধূর্জটির সাক্ষাতের আগেই তার বিষয়ে অনেক ভাবা গেল। যাকে বলে স্পেকুলেশন। তার কারণও স্বাভাবিক এই যে, আমার কাছে এখন সে-ই সব। এখন তাকে নিয়েই আমার যাত্রা। আমার সংসার বললেই বা ক্ষতি কী। আমার একলা জগতের নিরালা ঘরে, এখন আমি আর ধূর্জটিপ্রসাদ।

প্রথম দিনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথাটাই বলি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সময়টা ঋতুর দিক থেকে বর্ষাকাল উত্তীর্ণ বলা যায়। কিন্তু কথায় বলে, নারী আর পানীর মনের কথা কেউ বলতে পারে না। অর্থাৎ নারী ও বৃষ্টি। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, বাঙলাদেশে বারো

মাসেব, যে কোনো মাসেই বৃষ্টি হতে পারে। প্রতি বছর না হলেও, এমন বছর থাকে, বারো মাসের কোনো-না-কোনো একদিন বৃষ্টি হতে পারে। সেজন্যই বৃষ্টির ব্যাখ্যায়, খনার বচনে বারো মাসেরই উল্লেখ আছে। অতএব, নানী আর পানীর প্রবচনটি যিনিই সৃষ্টি করে থাকুন, তিনি ভুল করেননি, এবং সেই সঙ্গে মনুষ্য চরিত্র ধূর্জটিপ্রসাদকেও আমি যোগ দিয়ে নিচ্ছি। নিচ্ছি এই কারণে, প্রকৃতিও সেইদিন যেমন অবাক করেছিল, ধূর্জটিপ্রসাদও তা-ই।

সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকেই আমার বাইরে বেরোবার সময়। অন্য সময়টা কাজে বা পড়ায় কাটে। কয়েক বছর আগে, যে সন্ধ্যার কথা বলছি, সেই সন্ধ্যায় আমার নিজের এলাকা থেকে একটু দূরেই গিয়েছিলাম। রাত্রি দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতে পারবো, এইরকমই আশা ছিল। আশা করতে কোনো দোষ নেই, দুঃখ এই, নিরাশ করার দায়িত্বটা অন্যের হাতে। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন ট্যাক্‌সির জন্য আকুলিবিকুলি করছি, তখন তার আধ ঘণ্টা খানেক আগেই, বিজলির বৈদ্যুতিক খেল্‌ খতম হয়ে গিয়েছিল। একটা বিরাট অঞ্চল তখন অন্ধকারে ডুবে আছে। টের পাইনি, সেই যান্ত্রিক নষ্টামির সঙ্গে প্রকৃতিও কখন হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে। বাতাসে জলের গন্ধ পাইনি। বিদ্যুতের ঝিলিকে একটা যেন অব্যর্থ বর্ষণের শাসানি দেখা গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল, আমার এক মাঝি বন্ধু বলেছিল, এ সময়টা কোনো কোনো বছর ঝড়ও হতে পারে। হলে খুব প্রবল হয়। এবং তাদের ভাষায়, এ ঝড়কে বলে 'কেতেনের' ঝড়। যান্ত্রিক বদখেয়ালের সঙ্গে সেই কেতনের ঝড়ই উঠলো। কার্তিক মাসেই এমন ঝড় এবং তারপরেই প্রবল বর্ষণ শুরু হল।

কাছাকাছি ভালো কোনো আশ্রয়ের আশা করা যায় না। যে বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম, তার ওখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। ট্যাক্‌সি মরীচিকার পিছনে পিছনে অনেকখানি রাস্তা এসে পড়েছিলাম। রাত্রিও তখন দশটার কাছাকাছি, লোকজন তেমন কেউ রাস্তায় ছিল না। দু-চারটে ছোটোখাটো দোকান যাও বা খোলা ছিল, তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। বাস স্টপে একটি লোকও নেই। স্টপে দাঁড়াবার মতো মাথায় কোনো আচ্ছাদনও ছিল না। আমি একটি বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। মাথার ওপরে দোতলার বারান্দার আচ্ছাদন ছিল বটে, বৃষ্টির ঝাপটা থেকে তাতে রেহাই পাওয়া যাচ্ছিল না। যে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, সে বাড়িটাকে কেমন খালি খালি লাগছিল। দরজা জানালা বন্ধ, কোথাও কোনো আলো নেই। সাড়া-শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল না।

কী দুর্গতি! অসহায়ভাবে দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

অন্ধকার আর নির্জনতার জন্য খারাপ লাগছিল বেশি। মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল। এক সময়ে একটা সিগারেট ধরালাম। ইতিমধ্যে দু-একটা গাড়ি যেতে দেখেছি। বাস একটাও না। রাস্তায় জল জমতে শুরু করেছে।

কলকাতার এটা একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল বা বৃহত্তর কলকাতারই অংশ বলা যায়। চওড়া রাস্তা, বড় বড় বাড়ি এবং সরকারী ফ্ল্যাট, সবই আছে। কলকাতার দিক থেকেই তীব্র আলো জ্বালিয়ে একটা গাড়িকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। গতি দেখেই বোঝা যায়, বাস না, ট্যাক্সিও না। এ গাড়ি নিশ্চয়ই কোনো ঘরমুখো দ্রুতগামী যাত্রীর গাড়ি। তীক্ষ্ণ শব্দে হর্ন বাজিয়ে গাড়িটা আমাকে পার করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা জন্তুর আর্তনাদ তুলে ব্রেক কষলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিছনে লাল আলো দপদপ করছে। পরমুহূর্তেই গাড়িটা আবার একটু ব্যাক করে ডান দিকে জায়গা করলো. এবং একেবারে এ্যাবাউট টার্ন করে, যেদিক থেকে এসেছিল, অর্থাৎ কলকাতার দিকেই মুখ ফেরালো।

বৃষ্টি সেইরকম সমানেই চলেছে। ঝড়ের প্রকোপটা যেন একটু কমেছিল। অবাক হয়ে দেখলাম, সেই ফিরে যাওয়া গাড়িটা, আমার সামনেই বারান্দার গায়ে এসে দাঁড়ালো। গাড়ির ভিতরে অন্ধকার। কারা আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কেবল বিরক্ত ও মোটা গলা একটা শুনতে পেলাম, 'নিজেদের বাড়িটা কোথায়, তাও খেয়াল থাকে না?'

মনে হল, একটি মেয়ে গলার অস্পষ্ট হাসি শুনতে পেলাম। জবাবে শোনা গেল, 'কী বিচ্ছিরি অন্ধকার দেখেছেন? তার ওপরে বৃষ্টি। নিজেকেই মানুষ চিনতে পারে না।'

সেই পুরুষের গলা আবার শোনা গেল, 'এমনিতেই যেন তুমি নিজেকে চিনতে পারছ? তোমার চোখের নজর অনেকক্ষণ হারিয়ে গিয়েছে।'

মেয়ে স্বরে হাসি ও আবাদার, দুই-ই শোনা গেল, 'ইস্, মোটেই আমার নজর হারায় নি। আমি দিব্যি সব দেখতে পাচ্ছি।'

পুরুষের গলা শোনা গেল, 'কতো পেগ টেনেছ, কিছু খেয়াল আছে?'

এবার আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোনো মহিলা ও পুরুষের এ জাতীয় কথোপকথন শুনতে কেমন যেন শালীনতায় বাধছে। বিশেষতঃ যাঁরা বাক্যালাপ করছেন, তাঁরা হয়তো জানেনই না তাঁদের এই জাতীয় আলাপন আর একজন শুনছে। অথচ আমি আড়ি পেতে নেই। অতএব জানান দেবার জন্যই আমি আবার পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বর করলাম। সিগারেট ধরাতে যাবার আগেই মেয়ে-স্বর

শুনতে পেলাম 'কতো আর, পেগ দুয়েক হবে।'

পুরুষের স্বরে বিদ্রূপ ঢেউ দিয়ে উঠলো, 'সে তো তুমি যখন ন্যাকরা করছিলে, স্বামীর অসুখের দুশ্চিন্তা দেখাচ্ছিলে, তখনই খেয়ে বসেছিলে। তারপরে কম করে আট পেগ তো টেনেইছো। নাও, এখন নামো দিকিনি।' বলেই, পুরুষের স্বরে একটা ধমকের সুরে হুকুম শোনা গেল, 'এই নিতাই, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

গাড়ির পিছনের অন্ধকার থেকে জবাব পাওয়া গেল, 'না দাদা।'

'না দাদা তো চুপচাপ বসে আছিস কেন? ওঠ্, কলিং বেলটা বাজা, মিসেস ঘোষালকে বাড়িতে ঢোকা।'

ঠিক এ সময়েই আমি সিগারেটটা ধরালাম। সম্ভবতঃ নিতাই যার নাম, সেই পিছনের দরজা খুলে নেমে এল, এবং নামতে নামতেই বললো, 'কলিং বেল তো বাজবে না, কারেণ্ট বন্ধ আছে যে।'

হুকুম এল, 'তবে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মার। আমার আর ভালো লাগছে না।'

বলেই আমার সিগারেট ধরানো দেখে, সেই গলায় শুনতে পেলাম, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে দ্যাখ্ তো নিতাই। বাড়ির চাকরটা নাকি?'

কথাবার্তা রীতিমতো উগ্র, এবং ব্যক্তিটির গর্বিত চরিত্রও কিছুটা টের পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে নিতাই নামক লোকটি, যাকে যুবকই বলা যায়, অন্ধকারে আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ভাই?'

সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলাম। বললাম, 'আমাকে চিনবেন না, আমি বৃষ্টির জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।'

গাড়ির ভিতর থেকে সেই গলা শোনা গেল, 'তা বেশ ভালো জায়গাতেই দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু আমার চোখ তো আবার অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলে। চাকরবাকর যাই বলে থাকি, মুখের আদলটা চেনা-চেনা লাগছে কেন ভাই?'

জবাব দিতে ইচ্ছে করলো, পেটে সুরা আর পাশে নারী থাকলে অনেকেই ব্যাঘ্র হয়ে ওঠেন, এবং অন্ধকারে অনেককেই চেনা-চেনা লাগে। কিন্তু অজানা অচেনা এলাকা। কোনো কথায় যেতে ইচ্ছা করলো না। জবাবও দিলাম না। আবার ধমক শোনা গেল, 'আরে এই নিতাই, তুই কী করছিস্। দরজায় ধাক্কা মার। পুষ্প, তুমি নেমে যাও।'

যাঁর নাম পুষ্প, তাঁর ঈষৎ স্খলিত মিষ্টি গলা শুনতে পেলাম, 'বাব্বা, যেন তাড়িয়ে দিচ্ছ।'

'তাড়িয়ে আবার দেব কী। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না? আমার কি সংসার পরিবার কিছু নেই?'

পুষ্পই বোধহয় খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তা আবার নেই? তোমার সংসার পরিবার তো গোটা কলকাতায় ছড়ানো। কোন্‌টার কথা বলছ?'

'মোটেই না। আমার সংসার, পরিবার, যা বলো, একটাই আছে। আর যা কিছু আছে—যাকগে ওসব কথা।'

পুষ্পর একটু জড়ানো বা গোঙানো আদুরে অভিমানী গলা শোনা গেল, 'শনি শুনি, আর যা আছে, সে-সব কী? আস্তাকুঁড়ের ছাই, না? বলো বলো, সত্যি করে বলো, আমি তোমার আস্তাকুঁড়ের ছাই?'

পুরুষের ঈষৎ বিরক্তি মিশ্রিত, নকল হাসি ছোঁয়ানো স্বর শোনা গেল, 'না গো, তুমি হলে আমার সর্বক্ষণের, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, যাকে না হলে একদণ্ড চলে না। এখন গলাটা ছাড় তো।'

অন্ধকারে গলা জড়ানো আলিঙ্গনের দৃশ্য, আমি বাইরে থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। নির্বাপিত বিদ্যুৎ, কেতেনের ঝড়ের পরে এই বৃষ্টি, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, এবং এই নাটকীয় বা তার চেয়ে বেশি, বিচিত্র সংলাপ, সবই যেন দৈব, এবং এই দৈব ঘটনার সামনে এতোই অস্বস্তিবোধ করছি, কাছে-পিঠে আর একটি সামান্য আশ্রয় থাকলে, সেখানেই ছুটে যেতাম। একটাই ভাগ্য, কুশীলবেরা কেউ আমার পরিচিত না। যদিও ইতিমধ্যেই তারা জেগে গিয়েছে, অন্ততঃ একজন দর্শক এবং শ্রোতা তাদের সামনে রয়েছে, অবিশ্যি তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না, তাদের আচরণ কথাবার্তা তাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। দিতেই পারে। মনে হয়, এরা এখন সকলেই দ্রব্যগুণে তুঙ্গে অবস্থান করছে, তুরীয় অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিকভাবে আচরণ করবে, কথা বলবে, আশা করা যায় না। কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, আমার অবস্থা অনেক বর্ষায় ভেজা একটি কাতর বিশেষ জীবের মতো, অথচ মানুষিক বোধ বুদ্ধি অনুভূতিগুলো সমান কাজ করে চলেছে। আমি আর পরকীয়া প্রেম, (কথাবার্তা থেকে এরকম একটা সিদ্ধান্তেই আমাকে আসতে হয়েছে, কারণ প্রথম দিকের সংলাপে জানা গিয়েছিল, নায়িকা পানীয়ের প্রথম পদাঘাত—'পদাঘাত' বললাম এই কারণে, সুরাপায়ীরা 'কিক্' বলে একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে যাকে বোধহয় পানীয়ের ধাক্কা বোঝায়। যাই হোক, নায়িকা পানীয়ের প্রথম পদাঘাতে তাঁর স্বামীর অসুস্থতার কথা বলেছিলেন। তার মানে, তিনি বিবাহিতা, এবং এখন যাঁর কণ্ঠলগ্ন, তিনি—তিনি কী? প্রেমিক? সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হতে পারলেও, ওই জাতীয় একটা কিছু ধরে নেওয়া যেতে পারে, অতএব 'পরকীয়া প্রেম' কথাটা এখানে ব্যবহারের অযোগ্য নয়।) সংলাপ ও সংলাপের মাধ্যমে আচরণের আন্দাজগুলোকে,

নির্বিকার দাঁড়িয়ে শুনত পারছি না। এমন কি, আমি বোধহয় কারোকে বোঝাতেও পারবো না যে, এসব উপভোগ করবার মতো রুচি বা মানসিকতাও আমার নেই।

এদিকে বারান্দার এক প্রান্তের দরজায় নিতাই নামক চরিত্র দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা মেরে চলেছে। আমি বৃষ্টিতেই পথে নেমে পড়বো কী না, এ-কথা ভাবতে ভাবতে, ঘন ঘন সিগারেট টেনে চলেছি। ওদিকে, গাড়ির অভ্যন্তর থেকে সংলাপ শুনতে পাচ্ছি, তা এইরকমঃ

পুষ্পঃ 'না, গলা ছাড়বো না।'

পুরুষঃ 'তাহলে টিপে মেরে ফেলো। তোমার খেয়াল নেই, বারান্দায় একজন দাঁড়িয়ে আছে।'

পুষ্পঃ 'থাকুক, আমার তাতে কী। তুমি আমাকে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বললে। আর তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার টেলিফোন করেও এক মাসের মধ্যে তোমার দেখা পাবো না।'

পুরুষঃ 'আহ্, ছড়ো, কী হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, বারান্দায় যে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা আমার চেনা।'

আমার চমকে ওঠবারই কথা। এর আগেও এ-রকম একটা কথা শুনেছি। নারীর বাহুবেষ্টিত মাতালের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। এখনো তা-ই মনে করা উচিত, একটু অবস্থার হেরফের। অর্থাৎ নারীর বাহুবেষ্টন থেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষী মাতালের প্রলাপ। কেননা, গাঢ় অন্ধকারে কিছু কিছু হিংস্র পশু পাখী একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গকেও দেখতে পায়। কিন্তু গাড়ির ভিতরের পুরুষটি সে-রকম ক্ষমতার অধিকারী বলে আমি বিশ্বাস করি না। সম্ভব অসম্ভব বলে একটা কথা আছে। তাছাড়া, নিজের পরিবেশ এবং পরিচিতদের বিষয়েও আমি একেবারে বিস্মৃত বা অনুমানহীন মনের মানুষ নই। এ-রকম কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় থাকা সম্ভব না, ছিল বলেও মনে হয় না।

সংলাপ পুনর্বার এবং সেই সঙ্গে এখনো দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতঃ

পুষ্পঃ 'তোমার সঙ্গে তো দুনিয়ার লোকের চেনা, তাতে আমার কী।'

পুরুষঃ 'তোমারই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে যে।'

পুষ্পঃ 'থাকুক।'

পুরুষঃ 'মাতাল আর কাকে বলে। তুমি এত বড় লোকের নামকরা বৌ, তোমার একটা—।'

পুষ্পঃ 'ভুল বললে। নামকরা বৌ নই, নামকরা বড়লোকের বৌ। আমার আবার নাম কী?'

আমি সিগারেটে শেষ টান দিলাম, এবং বৃষ্টিতেই নেমে যাবো স্থির করলাম। এ সময়েই পুরুষের গলায় রীতিমতো ধমকের সুর শুনলাম, 'তোমার কী নাম, তা আমি জানি, এবার নামো। নেমে দরজায় গিয়ে চেঁচাও, চাকর বেয়ারা সবগুলোকে গিয়ে চাবকাও।'

বলতে বলতেই, গাড়ির সামনের দিকের বাঁয়ের দরজাটা খুলে গেল। পুষ্পর গলা শোনা গেল, 'একি, আমাকে ঠেলে ফেলে দেবে নাকি?'

পুরুষের গলাঃ 'আয়াম হেল্‌পলেস্‌, প্লিজ গো পুষ্প।'

বলতে বলতেই, ঝরঝর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে হর্ন চিৎকার করে উঠলো। তার মধ্যেই পুরুষের চিৎকার শোনা গেল, 'নিতাই, তুই চলে আয়।'

ঠিক এ সময়েই বাড়ির ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল, এবং বারান্দায় একটি ক্ষীণ আলোর রেশ পড়লো।

নিতাই নামক লোকটি যাকে এখন আমি স্পষ্টতঃই যুবক দেখলাম, সে বেশ রেগে বলে উঠলো, 'কী করছিলে বাবা বাহাদুর, এ তো গাঁজায় নয়, গুলিখোরের নেশা।'

আমি তখন বারান্দা থেকে নেমে যেতে উদ্যত। কিন্তু মহামানবত্বের কোনো দাবিই আমার নেই, থাকলেই বা আমার অবচেতনে তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেয়। আমি কৌতূহলিত হয়ে একবার দরজার দিকে ফিরে তাকালাম। মোমবাতি হাতে যাকে দেখলাম, সে একজন ফরসা নেপালী। তার মুখে বোকা-বোকা নির্দোষ হাসি, বললো, 'কেয়া করে গা, মোমবাতি নেই মিলতা রহা।'

ইতিমধ্যে যাঁর নাম পুষ্প, তিনি গাড়ি থেকে নেমে এলেন। আবার আমার নিতান্ত মানুষিক চোখ সেদিকে ছুটে গল। দেখলাম, নানা বর্ণ রঞ্জিত একটি শাড়ির আঁচল প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করে, তিনি বারান্দায় উঠে এলেন। মহিলাদের বয়স অনুমান করা, প্রায় সময়েই অসম্ভব। স্বল্পালোকে এইটুকু মাত্র লক্ষণীয়. মহিলা সুগৌরী, উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যবতী। চুল খোলা এবং ঘাড়ে গালের কাছে লুটানো। হাতে একটি ছোট ব্যাগ। কাঁচুলি, নাভির নীচে শাড়ির বন্ধনী। পলকের মধ্যে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিলাম এবং বারান্দার সিঁড়িতে পা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম। আর সেই মুহূর্তেই, যা অসম্ভব, অকল্পিত এবং প্রায় ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, আমি পুরুষ গলায় আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম।

এতোই চমকে উঠলাম, বিভ্রান্তভাবে আমি আবার বারান্দাতেই উঠে এলাম। এই পেছিয়ে আসার মধ্যে, আমার অবচেতনে কোনো ভয় ছিল কী না জানি না। হয়তো ছিল। দিনকাল এবং সময় হিসাবে, অপরিচিত জায়গায়,

এরকম একটা পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে, অচেনা লোকের মুখে নিজের নামটা শুনলে ভয়ও লাগতে পারে। ততক্ষণে পুষ্প নামে মহিলাও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, আমার দিকেই তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁর সুরারক্ত চোখ আমাকে দেখতে পাচ্ছিল কী না, জানি না। আমি বিদেশী প্রখ্যাত সুগন্ধির গন্ধ পাচ্ছি। পুষ্প জিজ্ঞেস করলেন, 'কে মশাই আপনি আমার দরজায়?'

গাড়ির ভিতর থেকে পুরুষের শাণিত বলিষ্ঠ স্বরের নির্দেশ শোনা গেল, 'যাও যাও, তুমি ভেতরে যাও।'

তারপরেই আবার আমার নাম ধরে ডাক শোনা গেল, 'কই হে, বাড়ি যেতে হবে তো, না কি। উঠে এস গাড়িতে। আমার পাশেই এসে বসো।'

এই মুহূর্তে হঠাৎ একটা সন্দেহ হল, এ গলার স্বর যেন কেমন চেনা-চেনা। যেন বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসছে, চিনেও চিনে ওঠা যাচ্ছে না। আমি বললাম, 'আপনাকে আমি ঠিক—।'

'চিনতে পারছ না, না? গাড়িতে এসে বসলেই চিনতে পারবে। তোমরা লেখক সাহিত্যিক মানুষগুলো বরাবরই একটু ম্যাদামারা গোছের অতি ভদ্দরলোক হও। জানো সবই, তবু যেন ভাজার মাছটি উল্‌টে খেতে জানো না। এসো এসো, চলে এসো। এ অঞ্চলে তোমার আর দরকার নেই তো?'

সত্যি কথাই বললাম, 'না।'

'নিশ্চয়ই ঝড়ে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছ?'

সেটাও সত্যি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাহলেই বোঝ, আমি হঠাৎ এখানে কেমন করে এসে পড়লাম? জানি না, তোমরা আবার দৈব-টৈব মানো কী না। এসেছিলাম একটা কাজেই, মানে ওকে (মহিলাকে) নামাতে। দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। একে দৈব ছাড়া কিছু বলে না। এখন তুমিই দৈবকে মেনে নাও, আজ রাত্রে আর এ অঞ্চলে বাস-ট্যাক্‌সির আশা করো না। চলে এসো।'

কিন্তু এদিকে আর একটি ছোট ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিল। পুষ্প হঠাৎ আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে, আমার নামোচ্চারণ করে বললেন, 'ওহ্‌, আপনিই সে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু উনি এখন আপনার খোয়ারি কাটাবার জন্য আপনার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকবেন না।'

বলাবাহুল্য এই বিদ্রূপাত্মক শাণিত জবাবটি আমার না, গাড়ির ভিতরের পুরুষের। এবং এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই, যার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোনো পরিচয় ছিল না, এ পুরুষ সেই ধূর্জটিপ্রসাদ

মিত্র। কিন্তু লোকটির সম্পর্কে নানা মিশ্রিত কথাবার্তা শুনেছি, কখনো কখনো ভেবেছিও। এবং আজ বেশ কয়েক মিনিট ধরে যে ঘটনা দেখলাম, প্রায় একটি নাটকীয় দৃশ্যের মতোই, এবং যেসব সংলাপ শুনলাম, তারপরে স্বভাবতঃই তার সাহায্য নেব কি না, ভেবে স্থির করে উঠতে পারছি না। ধূর্জটিপ্রসাদ অবিশ্যি কোনো ভণিতাই করেনি, একেবারে সোজাসুজি 'তুমি' সম্বোধন করে সে আমাকে ডেকেছে। বয়সের তুলনায় বা মেজদার বন্ধু হিসাবে ডাকতেই পারে। কিন্তু লোকটি যে আমাকে চেনে, এ সংবাদ আমার একেবারেই জানা ছিল না। শুধু তা-ই বা বলি কেন। ধূর্জটি-প্রসাদের মতো ব্যক্তি যদি আমাকে চিনেও থাকে, এই অন্ধকারে সে আমাকে চিনলো কেমন করে। আমার মুখই বা সে দেখলো কী করে।

গাড়ির ভিতর থেকে প্রশ্ন এলো, 'কি হে, আমার সঙ্গে যাবে না ঠিক করেছ নাকি?'

বিনয়ের আশ্রয় নিয়ে বললাম, 'আপনার যদি কোনো অসুবিধা হয়?'

'আরে আমার অসুবিধার কথাটা আমাকেই ভাবতে দাও না। অসুবিধা হলে কি আর তোমাকে বলতাম?'

'আপনি তো আর জানতেন না, আমি এখানে থাকবো।'

'নাও, এদেরই বোধহয় লেখক বলে। তুমিই কি জানতে, এ সময়ে, এ ভাবে আমি এখানে আসবো?'

'না।'

'তবে? উঠে এসো, আর দেরি করো না। তোমাকে পেঁছে দিয়ে, আমিও বাড়ি যাবো। এসো এসো।'

মনে পড়লো, ধূর্জটিপ্রসাদ আমাকে ম্যাদামারা ভদ্দরলোক বলছিলেন। সে-সবের জবাব দেবার জায়গা এটা না। তবে লেখক-সাহিত্যিক যা-ই হই, গুরুজনদের দু-একটি পুরনো প্রবাদ মনে পড়ে গেল। নিজের থেকে সেধে আসে, এমন কিছু কিছু বস্তু বা বিষয় আছে, যা ফিরিয়ে দিতে নেই। পুষ্প তখনো দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পিছনেই মোমবাতি হাতে মমির মতো মুখ নিয়ে বাহাদুর। আমি একবার সেদিকে দেখলাম। নমস্কার করাটা উচিত কিনা, বুঝতে পারলাম না। অস্ফুটে একবার উচ্চারণ করলাম, 'চলি।'

তারপরেই নেমে গিয়ে, ধূর্জটিপ্রসাদের পাশে বসে, দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। পিছনে তখন সেই নিতাই বসেছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ পুষ্পকে একটি কথা না বলে বা বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে, দ্রুত চলতে লাগলো। গাড়ির হেড় লাইট জ্বলছে। বৃষ্টিপাতের ঘনত্ব তাতে বোঝা যাচ্ছে। রাস্তায় বেশ জল জমেছে। ধূর্জটিপ্রসাদের গাড়িটি বিদেশী,

একটু উঁচুও আছে। এই জলের ওপর দিয়ে, আমাদের দেশী গাড়ির ওপরে কতোটা ভরসা করা যেতো, জানি না।

ধূর্জটিপ্রসাদের ডানদিকে, গাড়ির গায়ে, গেলাস রাখবার টাম্‌লবার র‍্যাকে গেলাস ছিল। অন্ধকারে দেখতে পাইনি, দেখতে পেলাম, যখন ধূর্জটিপ্রসাদ গাড়ি চালাতে চালাতেই হাতে গেলাস নিয়ে চুমুক দিল। ড্যাস্‌ বোর্ডের আলোয় সোনালী পানীয় টলমল করে উঠলো। ধূর্জটি-প্রসাদ লম্বা চুমুক দিয়ে, আবার যথাস্থানে গেলাস রাখলো। সিটের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিয়ে, অবলীলাক্রমে, এক হাতে সিগারেট ধরালো। অস্বীকার করতে পারি না, আমি রীতিমতো কৌতূহল এবং বিস্ময়বোধ করছি। যে লোকটির সঙ্গে জীবনে কোনোদিন মুখোমুখি কথা বলিনি, ধারণা করেছিলাম, যে লোক আমাকে মোটে চেনেই না, সে লোক এমন গাঢ় অন্ধকারে আমাকে চিনলো কেমন করে। এটাকে একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে আমি যেন মেনে নিতে পারছি না। তাছাড়া যে ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটে গেল, তারপরেও ধূর্জটিপ্রসাদ আমাকে না চেনার ভান তো করেইনি, বরং নিজের পরিচয়টা সে যেচেই দিয়েছে। যেন ঘটনাটা কিছুই না।

অবিশ্যি আপেক্ষিকতাকে মানতে গেলে, কার কাছে কোন্‌ ঘটনার কতোখানি গুরুত্ব আছে, বা বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি কি হবে, তা সবই নির্ভর করে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং পরিবেশের ওপর। আমি আশা করছি, ধূর্জটিপ্রসাদ হয়তো, কৈফিয়ৎ না হোক, নিজের মুখ রক্ষার জন্য মোটা-মুটি আমাকে কিছু বলবে। এবং এরকম সামনাসামনি মদ্যপানের জন্যও হয়তো আমাকে ভদ্রতাসূচক দু-একটি কথা বলবে। কিন্তু সে ধার দিয়েই সে গেল না। সিগারেট ধরিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রথমেই বললো, 'নেচারও আজকাল এম. এল.এ-দের মতো হয়ে গেছে।'

নেচার এবং এম. এল. এ. অর্থাৎ প্রকৃতি এবং মেম্বার অব লেজিস্‌-লেটিভ এ্যাসেম্‌বলির সঙ্গে কি সম্পর্ক, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই বললো, 'কি বলো হে, ঠিক বলিনি?'

সে এমন মুরুব্বির ভাবে কথা বলছে, যেন আমার থেকে কতোই বড়। মেজদার বন্ধু হিসাবে, ধূর্জটি আমার থেকে বছর তিনেকের বড় হতে পারে। অবিশ্যি মানুষের আচার-আচরণ, ভাবভঙ্গী, কোনো কিছুই বয়সের তৈরি হয় না। হয়, তার পরিবেশগত কারণে। বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে পারলে না? নাহ্‌, তোমরা লেখক সাহিত্যিকরা দেখছি কেবল প্যান্‌পেনে কাঁদুনি গল্প লিখতেই জানো। এম. এল. এ.-দের দেখনি,

কখন কোন্ পার্টিতে গিয়ে নাম লিখিয়ে বসে থাকবে, তা যেমন কেউ বলতে পারে না, আজকাল নেচারও সেইরকম হয়েছে। কার্তিক মাস শেষ হতে চললো, দুদিন বাদেই অঘ্রাণ মাস পড়বে, তার মধ্যে দেখ কালবোশেখীর মতো ঝড়, শ্রাবণের মতো বৃষ্টি। স্টুপিড! আমি তো বাপের জন্মে কোনোদিন এরকম দেখিনি।'

ধূর্জটিপ্রসাদ কথাটি ভুল বললো। তার পিতৃদেবের জন্মকে নিয়ে টানাটানি করার দরকার ছিল না। স্মরণশক্তি থাকলে, কার্তিক মাসে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যক্ষ করার কথা সে নিজেও বলতে পারতো। কিন্তু এ-সব কথা আমরা কেউ বিশেষ মনে রাখি না। কারণ কার্তিক মাসে ঝড়-বৃষ্টি কমই হয়। হলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। কারণ মাঠে মাঠে ধান তখন পাকার মুখে থাকে। কিন্তু ধূর্জটির আসল বিদ্রূপটা সত্যি মোক্ষম। আমি নানী আর পানীর কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু আধুনিকতম নানীদের, অর্থাৎ রাজনীতি-ওয়ালাদের কথাটা ভেবে দেখিনি, মনেও আসেনি। আমি ঋতু আর প্রকৃতির তর্কে না গিয়ে বললাম, 'ঠিকই বলেছেন।'

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'এর পরে কবে দেখব, বোশেখ মাসে কম্বল গায়ে দিতে হবে।'

আমার হাসি পেয়ে গেল, যদিও হাসলাম না। ধূর্জটি ঝড়বৃষ্টির ওপর রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছে।

তারপরেই সে জিজ্ঞেস করলো, 'এদিকে কোথাও কোনো কাজে এসেছিলে বুঝি?'

'এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম। বেরোবার সময় বুঝতে পারিনি, হঠাৎ এ-রকম ঝড় উঠবে।'

'কেউ-ই তা ভাবতে পারেনি। জঘন্য! সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম একেবারে আপসেট করে দিল। তার ওপরে এই কলকাতার রাস্তা, নরক ছাড়া কিছুই না। তোমার কি একটু চলবে?'

কথার প্রসঙ্গ এত আকস্মিক বদলে গেল যে, খেই ধরতে পারলাম না। ধূর্জটিপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম। ড্যাসবোর্ডের আলোয় তার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি। ঠোঁটের কোণে সিগারেট। চোখ রক্তিম, কিন্তু দৃষ্টি সামনের দিকে, স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ন। মনে হয়, তার মাথার চুলে এখনো পাক ধরেনি। শক্ত ঘন, কিছুটা কোঁচকানো চুল বেশ বড়, এবং এখন রুখু উসকোখুসকো দেখাচ্ছে। চোখ নাক, রক্তিম চোখ দুটি বড় তবে চোখের চার পাশে ভাঁজ পড়ে, এবং এ্যালকেহলিক পাউচ্—অর্থাৎ ফোলা ভাব থাকায়, বড় বলে মনে হয় না। লখনৌ বুটির কাজ করা পাঞ্জাবির বোতাম খোলা। নীচে চুস্ত। একটু আগেই বারান্দায় পুষ্প নামে মহিলার গা

থেকে যে গন্ধ পেয়েছিলাম, এখানেও সে গন্ধ ছড়ানো। ধূর্জটিপ্রসাদের গা থেকে আসবে বা গাড়িতেই গন্ধটা রয়েছে, বুঝতে পারছি না।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'কী, আমার কথাটা বুঝতে পারলে না বুঝি? জিজ্ঞেস করছি, তোমার কি একটু ড্রিংক চলবে?'

আমি একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই বললাম, 'না না, তার কোনো দরকার নেই।'

ধূর্জটি যেন আমাকে প্রায় ধমকে ওঠার মতো করে বললো, 'আরে, দরকারেই কি সব হয় নাকি? ইচ্ছে বলে একটা কথা আছে তো?'

বললাম, 'না, সে-রকম কোনো ইচ্ছা করছে না।'

'একেবারেই চলে না নাকি?'

প্রসঙ্গটা চাপা পড়লেই খুশি হতাম। আর কিছু না, আপাততঃ ধূর্জটিপ্রসাদকে মিথ্যা কথা বলার অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেতাম। একেবারেই চলে না, এ-রকম নির্জলা মিথ্যা বলতে আটকায়। কিন্তু সত্যি বললে, এ-সব লোকের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া ভারি দুষ্কর, তা আমি জানি, এবং আজ এখুনি, এই গাড়িতে ধূর্জটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের পরেই তৃষ্ণা আমি একেবারেই বোধ করছি না। ইচ্ছাও নেই। তাই অর্ধ সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বললাম, 'কালে ভদ্রে। এখন একেবারেই ইচ্ছা নেই।'

'অলরাইট!'

ধূর্জটিপ্রসাদের কথা শুনলেই মনে হয়, সে-সব সময়েই একটা বিশেষ উচ্চাসনে বসে, অনুমতি এবং নির্দেশের ভঙ্গিতে কথা বলছে। তার গলার স্বরও সেইরকম। তেমন একটা মোটা বা হেঁড়ে বলতে যা বোঝায়, তা না। কিন্তু স্বরের মধ্যে একটা শাণিত গাম্ভীর্য আছে। তার মধ্যে যে একটি ব্যক্তিত্ব আছে, তা স্পষ্ট। সে তার বিদেশী ফিলটার টিপ্‌ড কিং সাইজ সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও, সিগারেট খাও। তোমার মেজদা, শীতুর কথা বলছি, ও অবিশ্যি দু-একবার আমার সঙ্গে ড্রিংক করেছে। নিতান্ত শখ করে। ও ও-সব পারে না। আজকাল অবিশ্যি পারে কি না, জানি না। ও তো আজকাল ইউ পি, টিউ পি, না কোথায় আছে?'

বললাম, 'ইউ পি-তে আছে।'

'মাল টাল খায় নাকি?'

হাসবো না রাগবো, বুঝতে পারছি না। ড্রিংক থেকে একেবারে 'মাল' কানে বড় লাগে। যদিও আমার মনে হচ্ছে, লেগে কোনো লাভ নেই। ধূর্জটিপ্রসাদের গলার স্বরে বিদ্রূপ নেই, সহজ প্রীতির সুরেই বাজছে।

হেসে বললাম, 'জানি না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ ঘাড় নেড়ে বললো, 'অনেককাল ওকে দেখিনি বটে, তবে বলে দিতে পারি, ও-সব কারণবারি পানটান ওর দ্বারা হবে না। হতে পারে তোমার দাদা, আমার তো বন্ধু ছিল। আসলে শীতু বেশ কৃপণ। টিপে টিপে টাকা জমাচ্ছে কেবল।'

কথাটা একেবারে মিথ্যে না। ধূর্জটিপ্রসাদ দেখছি মেজদাকে বেশ ভালোই চেনে। এতকাল পরেও বন্ধুর চরিত্রবৈশিষ্ট্য মনে রেখেছে। আমার মেজদা বরাবরই একটু কৃপণ এবং রক্ষণশীল ধরনের মানুষ। প্রকৃতির দিক থেকেও সাত্ত্বিক গোছের। বললাম, 'তা একরকম ঠিকই বলেছেন।'

ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ বললো, 'আরে তোমাকে নাম ধরে ডাকছি বলে কিছু মনে করছ না তো?'

যাক, কথাটা তাহলে ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হয়েছে। কিন্তু এত অনায়াসে সে আমাকে নাম ধরে তুমি বলে সম্বোধন করেছে যে, ব্যাপারটা মোটেই বিসদৃশ বা অস্বাভাবিক লাগেনি। আমি সিগারেট ধরিয়ে হেসে বললাম, 'মনে করবার সুযোগ দিলেন কোথায়?'

গাড়িটা হঠাৎ দু'বার পর পর লাফিয়ে উঠল। বেশ বড় রকমের খানায় পড়েছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ বাঘের মতো গরগর করে উচ্চারণ করলো, 'শুয়োরের বাচ্ছাগুলোকে এই সব খানায় ডুবিয়ে রাখতে হয়।'

কারা সেইসব শূকর শাবক, বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করে ঘাঁটাতেও সাহস পেলাম না। কী বলতে কী বলবে, কে জানে। গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে নিজেই আবার বললো, 'হারামজাদারা কলকাতা শহরটাকে ওদের নিজেদের রক্ষিতাদের বাড়ির উঠোন করে তুলেছে। নিজের বাড়ির উঠোন মনে করলেও এর থেকে ভালো রাখতো।'

একমাত্র ধূর্জটিপ্রসাদের মুখেই বোধহয় এ-সব কথা মানায়। কারণ সে যতো জানে, আমি ততো জানি না। তারপরেই সে আবার প্রসঙ্গ বদলালো, বললো, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে? মনে করবার সুযোগই পেলে না? কী করে পাবে বলো, তুমি শীতুর ছোট ভাই, তোমাকে আমি কী করে আপনি আজ্ঞে করে বলবো বল। অবিশ্যি তুমি এখন মস্ত লোক, নামকরা সাহিত্যিক—।'

এবার আমার লজ্জা করলো, সংকুচিত হয়ে বললাম, 'আপনি তা বলে আমাকে এ-সব বলবেন না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ খানিকটা জেদ আর ধমকের সুরে বললো, 'কেন বলবো না? আলবৎ বলবো। আরে, আমার বলার অপেক্ষায় আছে নাকি কেউ।

সকলেই বলে। আমি তো তোমার কথা উঠলেই বলি, ও আমার বন্ধুর ছোট ভাই। বলে বেশ আনন্দ পাই।'

বললাম, 'কিন্তু আপনি হয়তো আমার নামটা শুনেছেন, আমাকে যে চেনেন, তা জানতাম না।'

'তোমাকে চিনি না মানে? তুমি আমার পাড়ার কাছে থাকো, আর তোমাকে আমি চিনবো না? আমাকে তুমি চিনতে না?'

'চিনতাম বৈ কি।'

'তোমাকেও আমি চিনতাম। মাঝে-মধ্যে মনেও হয়েছে, তোমাকে ডেকে আলাপ করি। কিন্তু আমার আবার একটু মাথা গরম আছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে না চাও, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগতো। হয়তো তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলতাম।'

কিংবা তার থেকেও বেশি, ধূর্জটিপ্রসাদ হয়তো আমার পিছনে লেগে পাড়াছাড়া করে ছাড়তো। তার প্রতাপ এবং ক্ষমতার কথা কিছু কিছু আমার জানা আছে। অবাক লাগে কেবল তার বয়সটার কথা ভেবে। এত অল্প বয়সে, সে সবদিক থেকেই নিজেকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করলো কেমন করে। নিজেই আবার বললো, 'তাছাড়া আরো কি মনে হত জানো? মনে হতো, তোমরা সব শিল্পী সাহিত্যিক লোক, পীস্ লাভিং পীপল্। আমরা আর কেন তোমাদের শান্তি ভঙ্গ করি। এই ভেবেই আর এগোই নি।'

ধূর্জটিপ্রসাদের এই ধারণাটিকে আমি সম্যক বলে মেনে নিতে পারলাম না। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাজের চরিত্রটা বোধহয় তার ভালো জানা নেই। সেখানেও যে অনেক পূতিগন্ধময় আবর্জনা আছে, ঈর্ষা দ্বেষ ইতরতা নীচতা আছে, তা সে জানে না। আমি অবিশ্যি সে-সব কথা তাকে বলতেও চাই না বরং আমি এবার আসল কৌতূহলটা প্রকাশ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, অমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে? আমি আপনাকে অনেকবার দেখেছি, আপনার গলার স্বরও শুনেছি, অথচ আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি।'

ধূর্জটিপ্রসাদ হাসলো, বললো, 'ওই একটা ব্যাপারেই আমার নামটা বোধহয় সার্থক। আমার একটা থার্ড আই আছে, যা দিয়ে আমি অন্ধকারেও দেখতে পাই।'

জবাবটা পরিষ্কার হল না, বা আমার কৌতূহল মিটলো না। বললাম, 'থার্ড আই দিয়ে যে অমন অন্ধকারেও মুখ চেনা একটি লোককে কেউ চিনতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। সেই হিসাবে আপনার নামের থেকেও বেশি, আপনার চোখকে বাঘের চোখ বলতে হয়।'

ধূর্জটিপ্রসাদ আবার হাসলো। বললো, 'তুমি কালিদাসের কাব্য পড়নি? মহাদেব যখন কামশরে বিদ্ধ হয়ে পার্বতীকে বারে বারে নগ্ন করতে চাইছিলেন, গা থেকে সমস্ত জামাকাপড় খুলে নিয়েছিলেন, আর পার্বতী লজ্জায় মহাদেবের দু চোখে হাত চাপা দিয়েছিলেন, যাতে মহাদেব দর্শন-শৃঙ্গার না করতে পারেন। কিন্তু মহাদেব হেসে বলেছিলেন, দু চোখ চাপা দিলে, তৃতীয় চোখ দিয়ে যে সব দেখে নিলাম? তখন পার্বতীর সে কী লজ্জা! মহাদেবের অঙ্গকেই তখন নিজের আবরণ করতে চাইলেন।'

বলে ধূর্জটিপ্রসাদ হা হা করে হাসলেন। এই প্রথম পিছন থেকে নিতাই নামক যুবকটি হঠাৎ হেসে উঠে বললো, 'বাহ্, মহাদেব বেস্ রসুকে দেবতা ছিলেন তো?'

মুহূর্তে ধূর্জটিপ্রসাদের গর্জন শোনা গেল, 'চুপ কর মূর্খ।'

নিতাইয়ের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমি একটু মনে মনে অবাক হচ্ছিলাম। ধূর্জটিপ্রসাদের মতো লোক কালিদাসের কাব্যও পড়েছে! এবং তা মনেও আছে। কিংবা হয়তো কালিদাস কাব্যের অংশ-বিশেষই তার মতো লোকের মনে থাকে। কিন্তু তাহলে. নিতাইকে ও-রকম ধমক দিয়ে উঠবে কেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই আবার বললো. 'আসলে মহাদেব টহাদেব বলে কোনো কথা না, অন্ধকারে আমি সত্যি ভালো দেখতে পাই. বোধহয় দিনের আলোর থেকেও। অন্ধকারের জীব তো। প্যাঁচা, শেয়াল. ওই সব আর কী। বাঘটাঘ আমাকে বলা যাবে না। তবে বাপু তোমাদের সাহিত্য কী বলে জানি না। অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে. যে আলো চোখে দেখা যায় না। যে আলো—।'

ধূর্জটিপ্রসাদ কথাটা শেষ করলো না। সহসা তার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। গেলাস টনে নিয়ে চুমুক দিল। ড্যাসবোর্ডের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। বাইরে বৃষ্টিধারার কম-বেশি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। হেড লাইটের আলোয় বৃষ্টির ধারা একরকমই মনে হচ্ছে। ওয়াইপার জল মুছে চলেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ আবার সিগারেট ধরালো। বললো, 'গাড়িটা দাঁড় করাবার মোমেণ্টেই চোখে পড়েছিল. সাম্বাভি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখন মেয়েটাকে নামাতে ব্যস্ত থাকলেও, বারান্দার অন্ধকারে মূর্তিটির দিকে ঠিক চোখ রেখেছিলাম। পাপী মন তো। পরের বৌকে নিয়ে র‍্যালা করে. তাকে পৌঁছে দিতে এসেছি. সাক্ষীটি আবার কে? অবিশ্যি ভয়ের কিছু ছিল না, কারণ পুষ্প দত্ত নামকরা লেডি। তুমি চেন তো পুষ্প দত্তকে?'

অবাক হয়ে বললাম, 'না তো?'

'সে কি হে, গ্রেট গর্জানন দত্ত, বাঙালী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, যে এখন বিছানায় মিশিয়ে আছে এবং আস্তে আস্তে চিতায় গিয়ে ধুলোয় মেশাবে, তার স্ত্রী পুষ্প দত্তকে চেন না?'

একেবারে থ হয়ে যাবার মতো আমার অবস্থা। কথাটা মোটে বিশ্বাস-যোগ্য কী না, সেটাই সন্দেহজনক। গজানন দত্তকে চেনে না বা নাম শোনেনি এমন লোক বাঙলা দেশে কমই আছে। গজানন দত্তের ঠাকুর্দার নামটাই বেশি পরিচিত। কেন না, তিনি শুধু বাঙালী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ছিলেন না। শিল্পপতি হিসাবে তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেশকর্মী। তাঁর শিল্পপতি হবার পিছনে কাজ করেছিল তৎকালীন স্বাদেশিকতা। গোটা দত্ত-পরিবারই বাঙলা দেশে পরিচিত। সেই গজানন দত্তের স্ত্রী পুষ্প দত্তকে আমি ওই অবস্থায় দেখলাম। ধূর্জটিপ্রসাদের এ-সব মাতালের প্রলাপ না তো। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পুষ্প দত্তকে চিনি না বটে, গজানন দত্তের নাম নিশ্চয়ই শোনা আছে। কিন্তু তিনি যে শয্যাশায়ী বা মরণাপন্ন, তা জানা ছিল না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'মরণাপন্ন, হ্যাঁ, এই যে শব্দটি বললে, একেবারে এপ্রোপ্রিয়েট। দ্য গ্রেট জি. ডাট্, এখন মরণাপন্ন। কোটি কোটি টাকার মালিক, লোকটা যে আমাদের মতো নেশা ভাং করতো, তাও না। আমাদের লিভার পেকে ফেটে মরে যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু না, কিংবা যে-হারে শরীরের ওপর অত্যাচার চলে, তাতে একটা খারাপ অসুখ-বিসুখ করে বিছানায় পড়ে থাকলে কেউ অবাক হবে না। নিজেও জানবো কাঠ খেয়েছি, আংড়া ছাড়ছি। কিন্তু গজানন দত্ত লোকটি সাত্ত্বিক ছিল। নিজে দশটা ক্লাবে যাতায়াত করতো, কোনোদিন এক ফোঁটা মদ খেতে দেখেনি কেউ। ভোগের অনেক সুযোগ ছিল, ভোগ করেনি। অথচ দেখ, কী একটা রোগ হল, লোকটা আস্তে আস্তে বিছানা নিল। এখন এই হাড্ডিসার চেহারা হয়ে গিয়েছে। দেখলে কষ্ট হয়। এমন না যে এ লোকের চিকিৎসা হয় না। কতো বড় বড় ডাক্তার দেখলো, কেউ লোকটাকে দাঁড় করাতে পারলো না। আজকাল যে সব রোগের নামটাম জানি, ব্লাড ক্যান্সার না ল্যুকেমিয়া, তাও না। এর পরে ভগবান নেই, তা আর বলা চলে না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ থামলো। গেলাস তুলে চুমুক দিল। ঠোঁটে সিগারেট রেখে, চুপ করে খানিকক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার মনে তার কথাগুলোই আবর্তিত হচ্ছিল। ধূর্জটির কথা শুনে বোঝা যায়, সে মাতালের প্রলাপ বকছে না। 'এর পরে ভগবান নেই, তা আর বলা চলে না' এই কথার পরে তার হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, এবং মুখে অন্যমনস্কতার

অভিব্যক্তি দেখে মনে হল, ভিতরে ভিতরে সে যেন বিচলিতবোধ করছে। বলতে পারি না, সে আত্মভয়ে বিচলিত, না কি গজানন দত্তর অসহায় অবস্থার জন্য। মনে মনে আমিও ধূর্জটির মতামতটাই মেনে নিলাম। সত্যি, যা কোনো অভাব নেই, এমন একটি ব্যক্তি অসহায় করুণ অবস্থায় শেষ দিনের অপেক্ষায় শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে।

ধূর্জটি হঠাৎ বললো, 'যাক গে, সে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। তা তুমি এত বড় একটা সাহিত্যিক, তুমি পুষ্প দত্তকে চেনো না, এ তো ভারি তাজ্জব ব্যাপার।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'এতে এত তাজ্জবের কী আছে বলুন তো? সাহিত্যিক হলেই কি এই মহিলাকে চিনতে হবে?'

ধূর্জটিপ্রসাদ রীতিমতো জোর দিয়ে বললো, নিশ্চয়ই। পুষ্প অবিশ্যি মাঝে মাঝে আমার ঘাড়ে এসে চাপে। ও যে কোন্ দিন কার ঘাড়ে চাপবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে তোমাদের ওই শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে ওর খুব মেলামেশা আছে। এমন কি তোমাদের ফিল্মস্টাররাও কেউ কেউ পুষ্প দত্তর বয় ফ্রেন্ড। পুষ্পের আর্টের জ্ঞান কী আছে, তা আমি জানি না। একটি মেয়েমানুষ ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝি না। কিন্তু তোমাদের শিল্পী সাহিত্যিকরা নাকি ওকে আবার খুব কদর করে, ওর একটু কৃপাদৃষ্টি পেলে নাকি বর্তে যায়।'

আমার দুর্ভাগ্য, এ হেন পুষ্প দত্তর নামটা পর্যন্ত আমার শোনা নেই। ধূর্জটি আবার হেসে বললো, 'নাহ্, সাহিত্যিক হিসাবে তুমি কোনো কর্মের না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পত্র-পত্রিকায় ভদ্রমহিলার নামটাম দেখেছি বলে তো মনে করতে পারছি না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ এবার একটু জোরে হেসে উঠলো, বললো, 'ওই তো, সেজন্যই বলে, রাম মরেছে বেগুনে।'

রাম মরেছে বেগুনে, সে আবার কী কথা? কোনোদিন শুনি নি। ধূর্জটি নিজেই তা পরিষ্কার করে দিল, 'কথাটা বুঝলে না তো? থাকি কলকাতার শহরে, কিন্তু আমরা পাড়াগেঁয়ে কথাও কিছু জানি। রাম বললেই সব বড় বোঝায়, তা নিশ্চয় জানো। এই যেমন ধরো রামছাগল, কেউ খিস্তি করে বলে, রামখচ্চর—অর্থাৎ রাম মানেই বড়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে ছোট ছোট বেগুনের মতো একরকম ফল হয়, তাকে বলে রামবেগুন। রাম বড় হয়েও ওই বেগুনেই মরেছে। কেন বলে, তা আমি জানি না। তা তোমার কথাটা হল সেইরকম, পুষ্প দত্তর নাম তুমি কখনো পত্র-পত্রিকায় দেখ নি? পুষ্প দত্তর পরিচয়ের জন্য খবরের কাগজের দরকার হয় না।

সে সভা-সমিতিতে যায় না, বক্তৃতা করে না, ফ্যাশান প্যারেডে যায় না, কিন্তু সমাজের অনেক তা—বড় তা—বড় লোকের সে চাবিকাঠি। অনেককেই সে ঘায়েল করে রেখেছে। চাবিকাঠির দরকার সকলেরই হয়, সেজন্য পুষ্প দত্তকেও অনেকেরই দরকার হয়। তবে পুষ্প নিজে কারোকে দয়া না করলে, সাধ্য-সাধনা করে কিছু হয় না। তোমার বোধহয় সে-রকম কোনো দরকার কখনো পড়ে নি?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম দরকার?'

'এই ধরো, ব্যবসাট্যাবসার জন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা, পারমিট বা প্রাইজ বা কোনো কেচ্ছা-কেলেংকারিতে ফেঁসে গিয়ে, বাঁচবার চেষ্টা......।'

আমি এবার না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম, 'না, আমার সে-রকম কোনো দরকার হয় না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ স্টিয়ারিং থেকে দু হাত তুলে ভঙ্গি করে আবার স্টিয়ারিং ধরে বললো, 'ব্যস্, নিজের এলেমেই সব? সেই বিজ্ঞাপনের মতো, কাগজ কলম মন, লেখে তিন জন, এই নিয়েই তোমার চলে যাচ্ছে। তুমি তো খুব অহংকারি আছো হে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, আমি অহংকারি নই, বিশ্বাস করতে পারেন।'

ধূর্জটি বললো, 'আরে জানি জানি, ওটা তোমাকে ঠাট্টা করে বললাম। তবে ভাই আমি আবার একটু ঠোঁটকটা আছি, কিছু মনে করো না, তোমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেক ভেজাল মাল আছে। তারা শিল্পী সাহিত্যিক না হয়ে, আর কিছু হলেই ভালো করতো। তা সে-কথা থাক, পুষ্প দত্ত আমাকে অনেক উপকার করেছে। তবে ওই মাগীর—।'

ধূর্জটি থেমে গিয়ে জিভ কাটলো, 'ছি ছি ছি, প্রথম দিনের আলাপেই তোমার সামনে মুখ খারাপ করতে আরম্ভ করেছি।'

পুষ্প দত্তর প্রতি গ্রাম্য বিশেষণটা সহসা আমার শ্রবণকেও একটু অস্বস্তিদায়কভাবে বিদ্ধ করেছিল। তবে ধূর্জটি নিজের থেকেই যে সামলে নিল, তাতে খুবই স্বস্তি বোধ করলাম। ধূর্জটি বললো, 'আসলে কী জানো, সেই বলে না, "বলে বলে মুখ নষ্ট হয়ে গেছে" আমার হয়েছে সেই অবস্থা। তবে তোমাকে এটুকু বলে রাখছি, ও খিস্তিটা আমি পুষ্পর সামনেই পুষ্পকে দিয়ে থাকি, রাগ করে না, বরং খুশীই হয়। মেয়েদের মন কিসে খুশী আর অখুশী, বুঝি না। বলছিলাম, পুষ্প আমার অনেক উপকার করেছে বটে, কিন্তু ওর ধকল সহ্য করা বড় কঠিন। আমার মতো লোকও এ কথা স্বীকার করছে। তুমি নিজের চোখেই দেখলে তো, গাড়ি থেকে নামাতেই পারছিলাম না। এ-সব চরিত্রকেই নিম্ফোম্যানিয়াক বলে কী না,

আমি জানি না, তবে এক ধরনের ম্যাড্‌নেস্, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ভাবো, একলা আমি না, রোজ রাত্রেই পুষ্পর কারোকে না কারোকে চাই। পারেও বটে—তবে আমিই বা আর কী বলবো। ধূর্জটিপ্রসাদের মুখ থেকে পুষ্পর নিন্দা শুনলে কুকুরেও হাসবে। পারার দিক থেকে তো আমিও কম না। তবে—।'

ধূর্জটিপ্রসাদের সহসা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সে গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে, আবার যথাস্থানে রাখলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে, সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো। তারপরে মোটা নীচু স্বরে বললো, 'যে জ্বলে মরে, সে-ই জানে, জ্বালা কী। কেউ কি সাধ করে ছুটে বেড়ায়? দেখবে কারোর গায়ে যখন আগুন লাগে, সে কিন্তু স্থির হয়ে থাকতে পারে না, বাঁচবার জন্য সে তখন ছুটতে থাকে, হা জল হা জল করে। তখন হয়তো সে জল দেখেও চিনতে পারে না। পুষ্প সেই রকম, গায়ে আগুন নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একদিন যখন বুক চাপড়ে চুল ছিঁড়ে কাঁদে, তখন চেয়ে দেখা যায় না। ভোগের লালসা? সে তো অনেকেরই আছে। অনেককেই আমার চার পাশে দেখছি, তারা বিষ্ঠা খাওয়া কুকুরের মতোই তৃপ্ত, ভারী শান্ত আর নিরীহভাবে সমাজে ঢেঁকুর তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুষ্পর তো তা না। ওর কেনো সুখ নেই, তৃপ্তি নেই। তাই মনে হয় কোনো কোনো জীবনের ওপর দিয়ে, অলক্ষ্য থেকে কেউ একটা পরীক্ষা চালায়। পুষ্পর জীবনটা বোধহয় সেই রকম। বড় দুঃখী, বড় দুঃখী।'

ধূর্জটিপ্রসাদ শেষ কথাটি এমনভাবে বললো, যেন তার বুক টনটনিয়ে যাচ্ছে, এবং অস্বীকার করবো না, যাদের জীবন এবং অনুভূতি সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানি না, ধূর্জটির বলার স্বরে সুরে ও ভঙ্গীতে আমার মনটাও সহসা বিমর্ষ হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রমহিলার দুঃখ কিসের?'

ধূর্জটিপ্রসাদ হা হা করে হেসে উঠলো। বললো, 'সাহিত্যিক হয়ে এটা তুমি কী রকম কথা জিজ্ঞেস করলে হে। এ-সব তো তোমরা বুঝবে. তোমরা বলবে। আমি যদি জানতাম, পুষ্পর দুঃখ কী, তাহলে তো সকলের আগে আমিই ওর ওপরে ডাক্তারি করতাম। বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রুর সেই ঘটনা তোমার জানা আছে তো, যে পাঁচশো হাতীর পিঠে, পাঁচশো রাণীকে চাপিয়ে নিজে বুদ্ধদেবের কাছে বেণুবনে গিয়ে বলেছিল, "দেখুন, রাজ্য রাজত্ব রাজবৃত্তি রাজনীতি, ভোগ সুখ ঐশ্বর্য এ-সবই আমি জানি, আমার একটা উপলব্ধি হয়েছে কিন্তু তারপরে? তারপরে আমার আর কী জানার আছে, আপনি আমাকে বলুন। আমি অনেকের কাছেই এ-কথা

জানতে গেছি, মন মানে নি, সকলের শেষে আপনার কাছে এসেছি।" বুদ্ধদেব নাকি অজাতশত্রুকে জ্ঞানদান করেছিলেন, অজাতশত্রু শান্তি পেয়েছিলেন, যা জানবার তা জানতে পেরেছিলেন। আমি অবিশ্যি অজাতশত্রুর শান্তি আর জ্ঞানের উপলব্ধির কথা কিছুই বুঝতে পারি নি। শুধু এটুকু বুঝেছিলাম, সেই পিতৃহন্তা অজাতশত্রু নিজের জীবন নাশের ভয়ে, রাজগীর থেকে দূরে গঙ্গার ধারে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিল, যার নাম পাটলীপুত্র, আর নিজের ছেলেকে সেখানেই রেখেছিল।'......

কথাগুলো শুনতে শুনতে ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পর্কে আমার বিস্ময়কর নতুন অভিজ্ঞতা ঘটছিল। আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। তার কথাবার্তা শুনলে হঠাৎ অনুমান করা যায় না, তার নিজের জগৎ ছাড়া, কোনো বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আছে। কিন্তু তার এই কথাগুলো শুনে স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, বইপত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। যতো দূর মনে পড়ে, উক্ত বিষয় আমি 'মঝ্ঝিম নিকায়া'তে পড়েছিলাম, যা নিতান্তই বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় উদ্ধৃত।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই আমায় বললো, 'এ-সব কথা থাক। আমার মনে হয়েছিল, অজাতশত্রু সুখী ছিল না, সে সেইজন্য তার সুখের সমারোহগুলো সাজিয়ে নিয়ে বুদ্ধের কাছে গিয়েছিল, দুঃখের কারণসমূহ জানতে, দুঃখ নিবারণের কথা জানতে। কিন্তু দুঃখের নিবারণ হয় না। মিথ্যা কথা। দুঃখের যদি কোনো নিবারণ থাকে, তবে তা দুঃখের মধ্যেই বোধহয় আছে। একটা দুঃখ থেকে, আর একটা দুঃখ। পুষ্পের মুক্তি নেই। মুক্তি—।'

একটু থেমে আবার বললো, 'কারোরই নেই। তোমাদের সাহিত্যিকরা অবিশ্যি অনেকে অনেক কথা বলেছেন।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'দেখুন, আমাকে আপনি সে-রকম সাহিত্যিক মনে করবেন না, যে নিজেকে প্রফেট মনে করে। দুঃখ থেকে মুক্তির সন্ধান দেবার কথা আমি নিজেও জানি না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'তোমাকে হয়তো বোর করছি, কিন্তু ভাই তোমাদের কাছে অনেকে প্রফেটিজম্ আশা করে। যদি কিছু মনে না করো, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেকেই এই কাণ্ডটি করে গিয়েছেন, ফলে লোকের মনেও এ-রকম একটি ধারণা জন্মেছে, সাহিত্যিক মাত্রেই প্রফেট।'

আমি বললাম, 'দেখুন, অন্য সাহিত্যিকদের কথা আমি বলতে পারবো না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি, তিনি কেবল কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না। তার অধিক কিছু, তিনি ছিলেন অনেকটা তাপশ্চারী, তাঁর তপস্যার একটা উপলব্ধি ছিল।'

ধূর্জটিপ্রসাদের বোধহয় আমার কথা ভালো লাগলো না। সে পানীয়র গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে, আবার যথাস্থানে রেখে বললো, 'যাই হোক, পুষ্প দত্তকে নামাবার সময়েই, তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম। থামওয়ালা ঢাকা বারান্দাটা অনেক বড়। একটু সরে গিয়ে তোমার সিগারেট ধরানো দেখেই বুঝতে পারলাম, নিজের উপস্থিতি তুমি তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিতে চাইলে। যাকে বলে একেবারে পারফেক্ট জেণ্টেলম্যান। মাতাল মেয়ে-পুরুষের ব্যাপার, তারা কী বলাবলি করবে বা কী করে ফেলবে, ভাববে বাইরের কোনো লোক নেই, তাই তুমি সিগারেট জ্বাললে। ঠিক বলি নি?'

আমি হেসে ধূর্জটিপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম। তার আরক্ত চোখ সামনের দিকে। কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটু হাসি। সে যে মাতাল নয়, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আমি হাসলাম, কোনো জবাব দিলাম না, কারণ সে ভুল বলে নি।

ধূর্জটি বললো, 'সিগারেট জ্বালাবার সময়ই তোমার মুখ আমি পলকে দেখে নিয়েছিলাম। তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, মুখটা চেনা। কে হতে পারে? খুবই চেনা লাগলো? মনে মনে ভাবছি, আর পুষ্পকে নামাবার চেষ্টা করছি। তারপরে তুমি যতোবার সিগারেটে টান দিয়েছ, ততোবারই লক্ষ্য করেছি, আর হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল, মুখটা কার। আমার স্মৃতিশক্তি কোনোকালেই খারাপ ছিল না, লেখাপড়াটা অবিশ্যি তেমন করা হয় নি। তারপরে ভাবলাম তুমি এতো দূরে, এ-রকম জায়গায় কেন। একবার ভাবলাম, কী জানি, বলা যায় না, তুমিও হয়তো পুষ্প দত্তর পার্টি, তোমাকে বাড়িতে আসতে বলে, হয়তো আমার ওখানে চলে গেছে। পুষ্পর পক্ষে সবই সম্ভব। অবিশ্যি এটাও দেখলাম, পুষ্প তোমাকে দেখলো, কিন্তু চিনতে পারলো না, মানে তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই।'

ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ হেসে উঠলো। বললো, 'তা তোমাকে এই দুর্যোগের রাত্রে এত দূর থেকে বাড়ি পেঁৗছে দিচ্ছি, তার জন্য একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিচ্ছ না?'

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কাছে এখনো অবাক লাগছে, আপনি মাত্র একটা দেশলাইয়ের কাটির ঝিলিকেই আমাকে চিনলেন কেমন করে?'

ধূর্জটি বললো, 'একটা ঝিলিকেই এ-রকম কোইন্সিডেন্স ঘটে যায়। আসলে তোমার মুখটা আমার খুবই চেনা। তা যাই হোক, সাহিত্যিক, এবার একটা কথা বলতো। আমরা তো প্রায় পেঁৗছে গেলাম। ব্যাপারস্যাপার দেখে তোমার কী মনে হল?'

মুহূর্তের মধ্যেই আমি সাবধান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ ব্যাপার

বলুন তো?'

'আরে তোমার চোখের সামনেই যা ঘটলো, তার বিষয়েই বলছি।'

আমি হেসে বললাম, 'কী মনে হতে পারে বলুন।' হঠাৎ দেখলাম আর শুনলাম, মনে হবার মতো কোনো অবকাশই তো পেলাম না। তাছাড়া পুষ্প দত্ত সম্পর্কে আপনিই তে সব বলে দিলেন।'

ধূর্জটিপ্রসাদ হেসে বললো, 'এড়িয়ে যাচ্ছ সাহিত্যিক। জোর করবো না অবিশ্যি। যা কিছু ভাববার অধিকার তোমার আছে। তবে ভুল করো না। আর ভুল করে হঠাৎ একটা কিছু লিখে বসো না।'

কথাগুলো আদেশ বা নির্দেশের মতো শোনালো না। অনেকটা অনুরোধের সুরই যেন বাজলো। এতো সহজে আমি আমার লেখার রসদ এবং চরিত্র হিসাবে আজকের ঘটনাকে বেছে নেব। এ কথাই বা ধূর্জটি কেন ভাবলো। রচনার ক্ষেত্রে আমি এখনো নিজেকে তেমন দরিদ্র মনে করি না। কিন্তু আমি তার অন্য কথার জবাব দিলাম, 'আমি বিশ্বাস করি না, যা কিছু ভাববার অধিকার আমার আছে।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাও, আমাদের এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মোটে ভাববেই না?'

'সেটাও আমার ইচ্ছাধীন না। ভাবাবার জন্য ভেতরে একজন কাজ করে। সে যদি ভাবায়, তাহলে ভাবতেই হবে।'

'সে কি হে, তুমি যে আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলছ। তোমাকে তো যথেষ্ট বস্তুবাদী লেখক বলেই আমি জানি।'

হেসে বললাম, 'না, কোনো আধ্যাত্মিক কথা আমি বলি নি। সংসারে অনেক ঘটনাই তো আমাদের চোখের সামনে ঘটে। কিন্তু সব ঘটনা নিয়েই কি আমরা ভাবি বা লিখি? সবই আপেক্ষিক, ঘটনা চরিত্র তো বটেই, লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তার সঙ্গে জড়িত। সব ঘটনা চরিত্রই সব লেখককে ভাবায় না, তার মধ্যেও অনেক রকমফের আছে। কোনো কোনো ঘটনা আর চরিত্র হয়তো আমার ঘাড়ে এমনভাবেই ভূতের মতো চেপে বসে, আমি ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও, তা আমাকে নিষ্কৃতি দেয় না। তখনই সেই দায়িত্বটা এসে পড়ে, যে দায়িত্বের জন্য যা খুশি ভাববার অধিকার আর থাকে না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'বাহ্, ওয়াণ্ডারফুল একস্‌প্লানেশন। তোমার এই কথার জন্য, আমি একবার চিয়ার্স করি।'

বলেই গেলাস তুলে চুমুক দিল। আবার বললো, 'তোমার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। বুঝতে পারলাম, যা তোমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় না, বা তোমাকে ভাবায় না, অতএব সমস্ত ঘটনাই তাৎক্ষণিক, এবং তার মৃত্যুও

সঙ্গে সঙ্গে। এবং এ কথাও বুঝেছি, আজকের ঘটনা তোমার কাছে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'সে কথা কিন্তু আমি বলি নি।'

'তোমার বলবার দরকার নেই, আমি বুঝেছি। তারপরে আর বলবার দরকার নেই, ভুল করো না বা ভুল করে কিছু লিখো না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ এভাবে বললে, আমার কিছুই বলার থাকে না। কিন্তু আমি মনে মনেই জানি, ধূর্জটিপ্রসাদ আমার মনে কোথায় যেন নিজেকে বিদ্ধ করেছে। সমগ্র ঘটনার চমকও আমার মন থেকে মুছে যায় নি। পুষ্প দত্তর কথা আমি হঠাৎ ভুলতে পারি না।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই আবার বললো, 'তুমি সাহিত্যিক, বিশেষতঃ চেনাশোনা হল বলেই বোধহয় একটু দুর্বল হয়ে পড়ছি, তাই জিজ্ঞেস করছি, আমাকে তোমার কী মনে হল বল তো?'

হেসে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি কথাটা জানতে চাইলেন? সে অবকাশ কি আমি পেয়েছি। এত সহজে কি কারোর সম্পর্কে কিছু বলা যায়?'

'কিছুই কি যায় না?'

আমি আবার হাসলাম, বললাম, 'আপাততঃ জানলাম, আপনার দৃষ্টি আর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ন এবং আপনি পরোপকারী।'

'পরোপকারী?' ধূর্জটিপ্রসাদ যেন আকাশ থেকে পড়ে বললো, 'স্বার্থের সামান্য গন্ধ না থাকলে, ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র জীবনে কখনো কারোর উপকার করে নি। তবে হ্যাঁ, সে পরোপকারী সাজতে চায়। ভণ্ডামি না করলে, এ সমাজে চলতে পারবো না।'

কথাটা কতোখানি সত্যি, এ মুহূর্তে তা যাচাই করা সম্ভব না। বললাম, 'অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে তো তা-ই দেখলাম।'

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'কিন্তু এ কথাও তো তোমার মনে হওয়া উচিত ছিল, লোকটা লম্পট মাতাল?'

বললাম, 'তারো কোনো সঠিক পরিচয় আমি পাই নি।'

'হুঁ, তুমি লোকটি বাপু বেশ ঘুঘু আছো। কিছু মনে করলে না তো?'

হেসে বললাম, 'কিছুমাত্র না।'

'তোমার প্রশংসা করেই বললাম, তবে সকলের প্রশংসার ভাষা তো একরকম হয় না।'

'জানি।'

'তাহলে সাহিত্যিক, একটা কথা ঠিক হয়ে যাক। আমাকে জানবার অবকাশের দরকার নেই, মাঝে-মধ্যে তোমার সঙ্গ চাইলে, পাবো? তোমাকে আগেই বলেছি, অনেক দিনই মনে হয়েছে, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ-

সালাপ করি। কিন্তু এগোতে পারিনি, কী আবার ভাববে।'

কথাটা একদিক থেকে সত্যি। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে মিশে, আমি কী কথাই বা বলবো, সে নিজেই বা কী বলবে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল থেকে অমিলই বেশি। তবে লোকটি সম্পর্কে আমার একটু কৌতূহল আছে, আজ সেই কৌতূহল আরো একটু তীব্র হল। বললাম, 'সঙ্গ চাওয়া-চায়ির কী আছে। আপনার যদি ভালো লাগে, আসবেন।'

'অবিশ্যি তোমার কাজের ক্ষতি করবো না।'

'তা-ই বা কেন। আমি তো কেবল কাজের লোক না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ হেসে বললো, 'তার মানে অকাজও তোমার ভালো লাগে।'

বললাম, 'বলতে পারেন, একটু বেশি মাত্রায়।'

ধূর্জটিপ্রসাদ স্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাত তুলে আমার কাঁধে রাখলো। বললো, 'আমাকে তোমার কেমন লাগলো জানি না, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। যখন দেখবো, কিছুই ভালো লাগছে না, তখন তোমার কাছে যাবো।'

সেটাও এক বিপদের কথা। ধূর্জটি আবার বললো, 'তোমার যখন খুশি আমার কাছে এসো। খুব খুশি হব।'

'ঠিক আছে।'

গাড়ি আমাদের চেনা এলাকার মধ্যে ঢুকেছে। বৃষ্টির ধারা একটু কম। এদিকটায় আলো জ্বলছে। রাস্তায় অনেক জায়গাতেই জল জমে গেছে। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা পুষ্প দত্তর কি কোনো সন্তান নেই?'

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'আছে, একটি ছেলে আছে। ছেলেটির বয়স বোধহয় আঠারো উনিশ হবে। এখন এখানে নেই, শুনেছি লন্ডনে পুষ্পর দিদির কাছে চলে গেছে। ছেলেটাকে কয়েকবার দেখেছি, ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেই বোধহয় ভালো হতো, এমনই নরম কোমল আর মেয়েলি হাবভাব ছেলেটির। ছেলেদের মেয়ে ন্যাকরাগিরি দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে। পুষ্পর মুখেই শুনেছি, ছেলেটি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় না, কথাও বলতে চায় না, কেবল পুরুষদের সঙ্গেই মেশে। ওটাও একটা কেস্ হিস্ট্রি বলতে পারো।'

শুনে একটু অবাক লাগলো। ধূর্জটিপ্রসাদের কথা থেকেই বুঝতে পেরেছি, সে কী বলতে চায়। কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনায় আমার কোনো ইচ্ছা নেই। তার কথা থেকে কেবল এটুকু বোঝা গেল, পুষ্প দত্তর ছেলেটি যদি সব দিক থেকেই বেশ তৎপর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণ হত, তাহলে

পুষ্প দত্তর জীবনে তার কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারতো।

ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ বললো, 'হুঁ, সাহিত্যিক, পুষ্প দত্ত তাহলে তোমাকে একটু ভাবিয়েছে বলো।'

বললাম, 'হঠাৎ-ই কেন যেন জানতে ইচ্ছা করলো, উনি কোনো সন্তানের জননী হয়েছেন কী না।'

'আমি অবিশ্যি একটির কথাই জানি। তাহলে তুমি যদি বলো তো, পুষ্প দত্তর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই?'

আমি হেসে বললাম, 'তার কোনো দরকার নেই।'

'আলাপ করতে দোষ কী। জ্বালাতন না হলেই হল। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। তবে তোমাকে আমি এটুকু বলতে পারি, কিছুই হারাবে না। ওকে নিয়ে ইতিমধ্যেই কোনো কোনো লেখক লিখেছে, আর সকলের লেখাতেই পুষ্প হয়ে উঠেছে একটি মহীয়সী নারী। বুঝতে পারি, সবই কাজ গোছাবার তাল। অল্ রাবিশ...তোমার বাড়ির রাস্তাটা যেন কোন্ দিকে? ডাইনেরটা না?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ধূর্জটি আমার রাস্তায় গাড়ির মোড় ফেরালো, এবং কিছু জিজ্ঞেস না করেই, আমার বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ালো। বললো, 'তোমার বাড়ি দেখছি অন্ধকার।'

বললাম, 'মনে হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'কিংবা অন্ধকারেই জানালায় হয়তো কেউ মুখ বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে।'

বলে ধূর্জটিপ্রসাদ হাসলো। আমি কোনো জবাব না দিয়ে, দরজা খুলে নামবার উদ্যোগ করে বললাম, 'আপনাকে আর মুখের কথায় ধন্যবাদ দেব না। চলি, পরে আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

ধূর্জটি বললো, 'নিশ্চয়ই, সে তুমি না বললেও আমি আসছি। মানে অজাতশত্রু আসবে বেণুবনে বুদ্ধদেবের কাছে।'

বলে সে হাসলো। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, 'না না, ও-রকম কিছু ভাববেন না। আপনি যদিও অজাতশত্রু হোন, আমি মোটেই বুদ্ধদেব নই। আমি আমার নিজের জীবনের পথই হাতড়ে বেড়াচ্ছি।'

ধূর্জটি বললো, 'বুঝেছি বুঝেছি। তবু আমার কথাটা আমি বলে রাখলাম।'

আমি নেমে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলাম। ধূর্জটির গলা আবার শোনা গেল, 'ও. কে. গুডনাইট।'

গাড়ি এগিয়ে চলে গেল। নিতাই নামক লোকটির কথা হঠাৎ আমার

একবার মনে হল। সে বোধহয় গাড়ির পিছনের আসনে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখলাম, আলো জ্বললো, দরজা খুলে আমার ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে।

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে সেই আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। তারপরে বেশ কিছু বছর কেটে গিয়েছে। সে আমার সঙ্গ চেয়েছিল। বলতে গেলে, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছিন্নই ছিল। ঘটনা ঘটে গিয়েছে, এবং তার সঙ্গে সর্পিল নদীস্রোতের মতো বহু পরিবর্তন। বিশেষ করে, ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনের পরিবর্তন বিস্ময়কর। আজ সে যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেটাই যে তার জীবনের শেষ পরিণতি, আমি তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না।

একটু দার্শনিকতা করে বলতে গেলে, এই বলতে হয়, মানুষ মরণশীল, অতএব সকলেরই শেষ পরিণতি মৃত্যু। কিন্তু এ কথাও সত্যি, মৃত্যুই সব শেষ না। মৃত্যুর পরেও মানুষ বেঁচে থাকে। তবে আমি ধূর্জটির বিষয়ে ঠিক তা বলতে চাই না। সংসারে যারা বেঁচেও মরে থাকে, বা বারে বারে মরে, সে তা না। সকলের মতো সে মরণশীল নিঃসন্দেহে, কিন্তু বেঁচে আছে অত্যন্ত তীব্র ভাবে। আমার মনে আছে, সে প্রথম পরিচয়ের দিন একটা কথা বলেছিল, 'দুঃখের যদি কোনো নিবারণ থাকে, তবে তা দুঃখের মধ্যেই আছে।' তার সে কথার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। সে পুষ্প দত্তর কথা বলতে গিয়ে, কথাটা বলেছিল। আসলে কথাটা ছিল তার নিজের জীবনেরই। তার বেঁচে থাকার তীব্রতাও সেখানেই, এবং সেই প্রথম দিনের তার নিজের কথার মতোই, 'সংসারে কারোর কারোর জীবনের ওপর দিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়।'

ধূর্জটিকে আমি সব বুঝেছি, বলবো না। তবে একদিকে তার পাপবোধ, আর একদিকে তার বঞ্চনা, এই দুয়ের সংঘর্ষেই বোধহয় তার জীবনটা চলেছে।

প্রথম আলাপের প্রায় মাসখানেক বাদে, সন্ধ্যে নাগাদ ধূর্জটিপ্রসাদ আমার বাড়িতে এল। সত্যি বলতে কি, আমি তাকে ভুলে যাইনি বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে ভাবনা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাও হয়তো হতো না, যদি আমাদের এলাকার আশেপাশে এমন কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটতো, যার মধ্যে ধূর্জটি জড়িত। মাসখানেকের মধ্যে সে-রকম কোনো ঘটনাও ঘটেনি।

আমার ভৃত্য এসে জানালো, মিত্তিরবাবু বলে এক ভদ্রলোক এসেছেন। আমি তখন বাড়ি থেকে বেরোবার উদ্যোগ করছিলাম। মিত্তিরবাবু বলতে, সেই মুহূর্তেই ধূর্জটির কথা আমি ভাবিনি। বেরোবার মুখে বাধা পেয়ে, একটু বিরক্তই হলাম। বললাম, 'নিয়ে এস।'

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো ধূর্জটিপ্রসাদ। ঢুকেই বললো, 'কী ডিসটার্ব করলাম তো?'

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, আসুন, বসুন।'

ধূর্জটি না বসেই বললো, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, কোথাও বেরোচ্ছ।'

বললাম, 'হ্যাঁ, বেরোতে যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে আর তোমাকে আটকাবো না। আর একদিন আসবো।'

আমি বললাম, 'এসেছেন, একটু বসুন। এক কাপ চা খান।'

ধূর্জটি ডান হাতের কবজি উল্টে ঘড়ি দেখে বললো, 'তোমরা বুঝি এ সময়ে চা পান করো? ওটা আমার দ্বারা হয় না। জানো তো, অন্ধকার হলে শেয়াল প্যাঁচারা শিকারে বেরোয়। আমার অবস্থা খানিকটা সে-রকম বলতে পারো। এখন আমি অন্য কিছু পান করবো, চা না। তবে তোমার কাছে অবিশ্যি আমি তা চাইবো না।'

চাইলেও উপায় নেই, ধূর্জটির পানীয় আমার বাড়িতে নেই। তারপরে কী বলা উচিত, বুঝতে পারছি না। তার মৌতাত আমি নষ্ট করতে চাই না। সে তার ঋজু দীর্ঘ শরীরে একটা ঝাকুনি দিয়ে, মুখে ফুটিয়ে তুললো বিরক্তির অভিব্যক্তি। বললো, 'আসলে রোজই ঝকঝকে তকতকে আলো ঘর বিদেশী মদ আর মহিলা আর নাচ গান, কতগুলো মোসাহেব আর ফেউয়ের কেত্তন, এ-সব ভালো লাগে না। তাই ভাবলাম, তোমার কাছে চলে আসি। তা দেখছি বিধি বাম। কোনো জরুরি কাজে বেরোচ্ছ নাকি?'

সত্যি কথাই বললাম, 'না, তেমন জরুরি কাজ কিছু না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটু আড্ডাতেই বেরোচ্ছিলাম।'

ধূর্জটি বললো, 'তোমার বন্ধু হবার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই, তবে আড্ডাটা আমার সঙ্গেই হোক না।'

ভাবনাটা তো সেইখানেই। সামলাতে পারবো কী? ধূর্জটিপ্রসাদের আড্ডার অলিগলি চেহারা আমার তো তেমন জানা নেই। আমার দ্বিধা দেখে সে বললো, 'আরে ব্রাদার, একবার দ্যাখোই না। আজ আমার এক বিদেশিনী বন্ধুর সঙ্গে একটু বেরোবার কথা আছে। এ-সব মেয়ের সঙ্গে আমার মেলামেশা করার কথা না, কিন্তু কপালের লিখন এমনি, মেয়েটির সঙ্গে আমার কেমন যেন একটু জমে গেছে। অবাক হবো না, ও যদি আর একটা পুষ্প দত্ত হয়ে থাকে। আসলে মেয়েটি এসেছে ভারতীয় জীবন-যাত্রাকে জানতে, স্পেশালি কলকাতা। আলাপ হল একটা কনসুলেটে। আমার বাড়িতেও দুদিন এসেছে। কথাবার্তা শুনে মনে হল, তোমার সঙ্গে আলাপ হলে ভালো হয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ দেশের মহিলা?'

ধূর্জটি বললো, 'মহিলা? হ্যাঁ, তাও তো বটে, তোমাদের ওসব খেয়াল থাকে। আমি তো কেবল মেয়ে মেয়েই বলে যাচ্ছি। ও হল পশ্চিম জার্মানের মেয়ে।'

মনে রাখা দরকার, এ ঘটনা যখন ঘটেছে, তখনো এ দেশে হিপিদের প্রার্দুর্ভাব ঘটেনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে নিয়ে যাবেন, মহিলার কোনো অসুবিধা বা আপত্তি হবে না?'

'তাহলে কি তোমাকে বলতাম? ওকে আমি বলেই রেখেছি তোমার কথা। উৎসাহিত হয়ে বললো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করবে। তুমি তো আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে না। আজ মেয়েটিকে নিয়ে বেরোবার কথা। ভাবলাম, তোমাকে নিয়ে যাই। আমি তো বোঝই, মেয়েদের সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করতে পারি না। একটু তামসিক আছি তো। প্রকৃতিকে প্রকৃতি ধর্মেই পূজাপাট করতে ইচ্ছা করে।'

মনে মনে ভাবলাম, আর সেই পূজার পাট নিশ্চয়ই ধূর্জটিপ্রসাদ বাকি রাখেনি। এখনো যখন মেয়েটি তার সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছে না। দেখাই যাক, ধূর্জটির বিদেশিনী কেমন। বললাম, 'চলুন যাওয়া যাক। কোথায় যাবেন, কিছু ভেবেছেন নাকি?'

ধূর্জটি বললো, 'না, এখনো তা ভাবিনি, ওটা কৃষ্ট্যাল-ই ঠিক করবে, ওর কোথায় যেতে ইচ্ছা করে। তবে ও কোনো নামী দামী হোটেলে কিছুতেই যেতে চাইবে না। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় আচার আচরণ যেখানে আছে। ডিনার, ক্যাবারে, ওসব একেবারেই পছন্দ করে না।'

আমি একটু হেসে, ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললাম, 'তাহলে আপনার সঙ্গে মহিলা কাটাবেন কী করে?'

ধূর্জটি ভুরু কুঁচকে বললো, 'কী ভেবে বলছো বল তো?'

আমি হঠাৎ কিছু বললাম না। ধূর্জটি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট মুচকে হেসে বললো, 'ওহ্, তুমি কৃষ্ট্যালের ড্রিংকের কথা বলছো? ডিনার বা ক্যাবারে, ওসব পছন্দ করে না বলে, তুমি ভেবেছো, ও ড্রিংক করে না? ড্রিংকের ব্যাপারে আমিই ওর কাছে ছেলেমানুষ। ওর যে কোথায় লিমিট, তা আমি এ ক'দিনে বুঝতে পারিনি।'

মনে মনে ভাবলাম, খুব ভয়ের কথা। এমন মহিলা পুরুষদের সঙ্গে আমি কতোক্ষণ কাটাতে পারবো। তবু মনে মনে যখন স্থির করেছি, তখন আর কোনো দ্বিধা রাখবো না। বললাম, 'চলুন তা হলে?'

'হ্যাঁ, চলো।'

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে বাইরে এসে তার গাড়িতে উঠলাম। আজ তার

সঙ্গে কোনো বাহন নেই, আগের দিন যেমন নিতাই নামে একজন ছিল। গাড়ির চালক, যথাপূর্বই ধূর্জটি নিজেই। আমি তার পাশেই বসলাম। মধ্য কলকাতার খ্যাতনামা রূপসী রাস্তার এক আধুনিক ফ্ল্যাটের আট-তলায় উঠলাম লিফ্‌ট-এ করে। লিফ্‌ট-এ উঠতে উঠতে ধূর্জটি জানালো, জার্মান দম্পতী এই ফ্ল্যাটে থাকে। কৃষ্ট্যাল তাদের অতিথি হিসাবে কলকাতায় আছে। বেল পুশ্‌ করতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুললো স্বয়ং এক সোনালীকেশিনী গৌরী। প্রায় গায়ের রঙে রঙ মেশানো একটি মিনি স্কার্ট তার অঙ্গে। ডান হাতের দু' আঙুলে ফিলটার টিপড সিগারেট জ্বলছে। প্রসাধনের কোনো বালাই নেই। এমন কি ঠোঁটে একটু রঙ মাখানো নেই। এমন বিদেশিনী কম দেখেছি। বাঁ হাতের আঙুলে নানা রঙের পাথর বসানো এক ঢাউস আঙ্‌টি। ঢাউস-ই বলতে হয়, আঙ্‌টির আকারটি বৃহৎ। তার চোখ টানা-টানা, চোখের তারা গাঢ় খয়েরি রঙের। সে স্বাস্থ্যবতী নিঃসন্দেহে। মিনি স্কার্টের নীচে তার সুবর্ণ-দীপ্তিশোভা ঊরু ও জঙ্‌ঘা কালিদাসের পার্বতীর কথা মনে করিয়ে দেয়। হাসিটি মিষ্টি। আমার নিজের অনুমানে, বয়স ত্রিশ হতে পারে।

ধূর্জটির হাত টেনে ধরে সে নিজে থেকেই করমর্দন করলো। ধূর্জটি আমাকে দেখিয়ে, আমার নাম ও পরিচয় দিল, এবং জানালো, এই মহিলাই কৃষ্ট্যাল। আমার সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে কৃষ্ট্যালের করমর্দন আন্তরিক মনে হল. বললো, 'ধূর্জটির কাছে আপনার কথা আমি শুনেছি. কিন্তু দুর্ভাগ্য, আপনার কোনো বই আমার পড়া নেই।'

আমি বললাম. 'তাতে কিছু যায় আসে না। কলকাতার একজন অধিবাসী হিসাবে আমাকে দেখুন।'

কৃষ্ট্যাল বললো. 'চমৎকার। তবে আমার বিশ্বাস. আমি যেভাবে বাঙলা ভাষার চর্চা করছি, শীগ্‌গিরই আপনার বই পড়তে পারবো।'

আমি বললাম, 'আপনি বাঙলা ভাষার চর্চাও করছেন?'

জবাব দিল ধূর্জটি, 'হ্যাঁ. ও ইতিমধ্যেই কয়েকটা বাঙলা কথা শিখেছে। কী কী শিখেছ. বলে দাও তো কৃষ্ট্যাল।'

বলাবাহুল্য. আমাদের কথাবার্তা ইংরেজির মাধ্যমেই হচ্ছিল। এবং আমরা বসবার ঘরে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম। কৃষ্ট্যাল তার বাঁ হাতের তর্জনী ডান হাতের তালুতে ঠুকে ঠুকে বললো, 'ভালবাসা।...সুব্রবাত। (সুপ্রভাত?) আপনার নাম কী।...আপনি ভাল আছেন?...মা কালী।... ইনকিলাব-জিন্দাবাদ!'...

কৃষ্টাল খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি আর ধূর্জটিও হেসে উঠলাম। ধূর্জটি কৃষ্ট্যালের কাঁধে একটু হাতের চাপ দিয়ে বললো, 'সুন্দর,

সুন্দর! তুমি কি এখন বেরোবে?'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'ওহ্, নিশ্চয়। আমার বন্ধুরা কেউ বাড়ি নেই। আমি তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম। এক মিনিট, আসছি।'

কৃষ্ট্যাল প্রায় দৌড়ে, পর্দা তুলে অন্য ঘরে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই, হাতে ভারতীয় কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে এল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে এসেছে। পিছনে পিছনে পায়জামা পরা একটি আমাদের দেশীয় লোক বেরিয়ে এল। কৃষ্ট্যাল বললো, 'চলো, যাওয়া যাক।'

আমরা বেরিয়ে আসতে সেই লোকটি দরজা বন্ধ করে দিল। ধূর্জটির নির্দেশ অনুযায়ী, আমরা তিনজনেই গাড়ির সামনের আসনে বসলাম। কৃষ্ট্যাল মাঝখানে। ধূর্জটি বললো, 'এবার বল তো কৃষ্ট্যাল, আজ তোমার কী অভিরুচি?'

কৃষ্ট্যাল ঠোঁট টিপে একটু হাসবার ভঙ্গি করে বললো, 'আমি আজ তোমাদের কান্ট্রি লিকার পান করবো।'

ধূর্জটি বাঙলায় বললো, 'বোঝ ঠ্যালা।' তারপরে ইংরেজিতে বললো, 'কান্ট্রি লিকার বলতে কী বলছ, ইন্ডিয়ান অথবা...।'

কৃষ্ট্যাল ওর সোনালী কেশে ঝটকা দিয়ে বললো, 'না না, আমি তোমাদের চোলাই করা মদ পান করবো। যে মদ দোকানে পাওয়া যায় না, যার কথা তোমার মুখে আমি আগে শুনেছি। অর্থাৎ তোমাদের ইল্‌লিসিট কান্ট্রি লিকার পান করবো, এবং সেটা করবো, সেখানকার আড্ডায় গিয়ে।'

ধূর্জটি বলে উঠলো, 'ও-সব পান করে তোমার শরীর খারাপ হতে পারে।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'এ দেশের হাজার হাজার মানুষের যদি শরীর খারাপ না হয়, আমারো হবে না।'

ধূর্জটি বললো, 'কে বললো হয় না। অনেকে মরেও যায়।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'আমিও মরবো। তোমার কি মরতে ভয় আছে?'

ধূর্জটি বললো, 'তোমার সঙ্গে থাকলে—নেই।'

কৃষ্ট্যাল ঝুঁকে পড়ে ধূর্জটির গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়ে বললো, 'ভালোবাসা।'

ধূর্জটি ইংরেজিতে বললো, 'ধন্যবাদ।' বাঙলায় বললো, 'তবু যদি থাকতো সংসারে। (অর্থাৎ ভালবাসা।) কী রকম বুঝছো হে সাহিত্যিক?'

বুঝতে আর পারছি কোথায়। আমি অবাক হয়ে স্বর্ণকেশিনী গৌরী যুবতীকে দেখছি, আর তার অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবছি। একটি জার্মান মেয়ে, তার শখ হয়েছে কলকাতার বেআইনি চোলাই মদ্য পানের। নিজের কানে না শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। ধূর্জটিপ্রসাদ না

না থাকলে, এসব অতুলনীয় অভিজ্ঞতাও বোধহয় কারোর হয় না।

বললাম, 'বিচিত্র!'

কৃষ্ট্যাল আমার দিকে ফিরে উচ্চারণ করলো, 'সেটা কি, বি-সি-ত্র?'

বিচিত্রের কী ইংরেজি বলা যায়। হঠাৎ আমার মনে এল না। আমি বললাম, 'বিস্ময়কর।'

'কেন বিস্ময়কর। বেআইনী চোলাই মদ আমি খেতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু এরকম অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষার কথা আমি কোনো মহিলার মুখে আগে শুনিনি।'

ধূর্জটি বলে উঠলো, 'মহিলা সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতার কথা আমার জানা নেই। গণিকাদের কথা বাদ দিয়েও তোমাকে বলতে পারি, বাঙলা দেশের বহু মেয়েই নিজেদের হাতে করে চোলাই করা মদ্য পান করে। তারা হয়তো তোমার চোখে তথাকথিত মহিলা নয়, কিন্তু তারা শ্রমজীবিনী, এবং স্বামী সন্তানদের নিয়ে সংসার করে।'

আমি বলতে গেলে, নিজের অভিজ্ঞতার লজ্জায়, হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু একেবারেই যে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তা বলতে পারি না। বললাম, 'মাফ করবেন। ঠিকই বলেছেন।'

কৃষ্ট্যাল হেসে উঠে বললো, 'আপনি নিজের দেশের অনেক কিছুই জানেন না দেখছি।'

ধূর্জটি বললো, 'অবিশ্যি এ কথা জানতেই হবে, তা না। তবে জেনে রেখো, মদ চোলাই করাটা রাঢ়ের কোনো কোনো অঞ্চলে একরকম কুটির-শিল্পের পর্যায়ে পড়ে।'

কৃষ্ট্যাল অবাক হয়ে বললো, 'সত্যি ধূর্জটি?'

ধূর্জটি বললো, 'সত্যি।'

'তোমার সঙ্গে আমি দেখতে যাবো। আমি দেখতে চাই, তারা কী ভাবে চোলাই করে।'

'সেটা আমি তোমাকে কলকাতাতেই দেখাতে পারি।'

'না, কলকাতায় না, আমি গ্রামে গিয়ে মেয়েদের চোলাই করা দেখতে চাই।'

ধূর্জটি বাঙলায় বললো, 'পাগলের ডিম।' ইংরেজিতে বললো, 'সময় করতে পারলে নিয়ে যাবো।'

কৃষ্ট্যাল যেন আবদারের সঙ্গে বললো, 'তোমাকে সময় করতেই হবে।'

ধূর্জটি যেন প্রবোধ দেবার জন্যই বললো, 'করবো।'

কৃষ্ট্যাল আমার দিকে চেয়ে হাসলো। ওর গাঢ় খয়েরি চোখের তারা ঝকঝক করছে। এ হাসির অর্থ, ধূর্জটিকে ও রাজী করাতে পেরেছে।

বললো, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন।'

বললাম, 'চেষ্টা করবো।'

কৃস্ট্যাল বললো, 'আপনার যাওয়া উচিত, দেখা উচিত, লেখা উচিত।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন, ধন্যবাদ।'

ইতিমধ্যে গাড়ি দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তায় ঢুকেছে। দক্ষিণ, কিন্তু অনেকটাই মধ্য ঘেঁষা। রাস্তাটা তেমন চওড়া না। রাস্তার আলো অনুজ্জ্বল। বড় বড় দোকানপাটও তেমন নেই যে, উজ্জ্বল আলো ছড়াবে। এ রাস্তার অংশবিশেষে ছোটখাটো কয়েকটি কারখানাও আছে। বড় বড় বাড়ি যেমন আছে, তেমনি বস্তিও চোখে পড়ে। ধূর্জটি গাড়ি দাঁড় করালো একটি পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটার দরজা বন্ধ। ফুটপাতের সিমেণ্ট উঠে গিয়েছে, সেখানে একটি খাটিয়া পাতা। একজন লোক সেখানে বসেছিল। উল্টো দিকে কয়েকটা ছোটখাটো দোকান। সেখানে আলো জ্বলছে। গাড়িটা যেখানে দাঁড়ালো, সেখানটা প্রায় অন্ধকার।

খাটিয়ায় যে লোকটি বসেছিল, সে আমাদের দিকে একবার দেখলো। তারপরেই আর একটি লোক কোথা থেকে এগিয়ে এল। ধূর্জটিকে দেখেই কপালে হাত ঠেকিয়ে খুশি গলায় বললো, 'আরে বাবা, বাবুজী, বহুতদিন পর।'

লোকটির কথা শুনে তাকে অবাঙালী বলে মনে হয়। ধুতি আর জামা পরে আছে। মাঝবয়সী, মাথায় টাক, এক জোড়া গোঁফ, অনেকটা সাধারণ শ্রমজীবীর মতো দেখতে। ধূর্জটি বললো, 'হ্যাঁ, এসে পড়লাম। কেমন আছো যোগীন্দর?'

যোগীন্দর তোষামোদের সুরে বললো, 'আপনারা না এলে, ভাল কেমন করে থাকব বাবুজী।'

ধূর্জটি হেসে বললো, 'বটে? এখন বলতো, ভালো জিনিসপত্তর কিছু আছে? না স্রেফ জল আর ভেজাল?'

যোগীন্দর জিভ কেটে বললো, 'ছি ছি বাবুজী. আপনি এমন কথা বলছেন? সে-রকম জিনিস আপনাকে কখনো দিয়েছি? আপনি জিভে ছোঁয়ালে বুঝতে পারবেন।'

ধূর্জটি বললো, 'ছোঁয়ালে কিছু বোঝা যায় না যোগীন্দর। পেটে গিয়ে কেমন কাজ করে, তাতেই বোঝা যায়। কিন্তু নিয়ে যাবো না, গাড়িতে বসেও খাবো না। তোমাকেই জায়গা দিতে হবে। সেই ঘরটা খালি আছে?'

যোগীন্দর বললো, 'জরুর, আপনি আসুন না।'

ধূর্জটি বললো, 'চলো। গেলাস-টেলাসগুলো ভালো করে ধুয়ে দিও।'

'আপনাকে কিছু বলতে হবে না। মেমসাহেবও খাবেন তো?'

'আরে তার জন্যই তো আসা। দেখো বাপু, তোমার বস্তিতে দু-একটা বদ মেয়ে আছে, তারা ঝামেলা করবে না তো?'

যোগীন্দর এক কথায় বললো, 'টুটি টিপে মেরে ফেলবো।'

কৃষ্ট্যাল ভাষা না বুঝেও, খানিকটা অপরিচিত কৌতূহলে ধূর্জটি আর যোগীন্দরকে দেখছিল। আমার বিস্ময়ের শেষ ছিল না। এতোকাল কলকাতায় আছি, এরকম কোনো ব্যাপার আমার জানা ছিল না। অবিশ্যি, মানুষ সবই তার প্রয়োজনে জানে। আমার প্রয়োজন হয়নি। তথাপি কলকাতার বহু রূপের অনেক কিছুই যে আমার অজানা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর অবাক লাগছে আমার ধূর্জটিকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে। ধরেই নেওয়া যায়, এ-সব জায়গায় সাধারণতঃ গরীব মানুষেরাই পান করতে আসে। ধূর্জটিপ্রসাদের মতো ধনবান প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে, পান করবার জন্য এখানে আসবার দরকার হয় না। কিন্তু তার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আজ অনেক দিন পরে এলেও, এখানে তার আসা-যাওয়া আছে। দেশী চোলাই মদেও তার তৃষ্ণা, তাও এরকম একটা হতভাগা জায়গায় এবং পরিবেশে। হতভাগা ছাড়া, এ স্থানকে আমি আর কী বলতে পারি।

যোগীন্দর খাটিয়ায় বসা লোকটির দিকে ফিরে বললো, 'বাবুলোগকো ঘর মে লে যা।'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ধূর্জটি বললো, 'চলো আমরা নামি।'

আমি আর কৃষ্ট্যাল নামলাম। ধূর্জটি গাড়ির জানালার কাচ বন্ধ করে, দরজা লক করলো। লোকটিকে অনুসরণ করবার সময়, কৃষ্ট্যাল ধূর্জটির একটি হাত চেপে ধরলো। আমি সকলের পিছনে।

লোকটিকে ফুটপাতের ওপর খানিকটা অনুসরণ করার পরে, সে একটি অন্ধকার সরু গলিতে ঢুকলো। এতো সরু, দু পাশের মাটির দেওয়ালে গা ঠেকে যাবার মতো। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটু এগোবার পরে, কাঁচা মাটির ঘরে লোকজনের গলার শব্দ পাওয়া গেল। লম্ফর আলোও দেখা গেল।

ধূর্জটি আমাকে বললো, 'ভয়-টয় পেও না।'

বললাম, 'না, আপনি থাকতে ভয় কী।'

লোকটি একটি ঘরের সামনে দাঁড়ালো। দরজার শিকল খুলতে খুলতে বললো, 'থেরা ঠার যাইয়ে।'

লোকটি শিকল খুলে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার পরেই দেশলাইয়ের কাটি জ্বলে উঠলো। কাঁচা মাটির এবড়ো-থেবড়ো দেওয়াল

ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। লোকটি কিছু একটা খুঁজছে। কাটি নিভে গেল। কাছাকাছি ঘরে মেয়ে-পুরুষদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি, এবং বুঝতে পারছি, বস্তির অধিবাসীরা সকলেই অবাঙালী। অন্ধকারের মধ্যেও আমি একবার কৃষ্ট্যালকে দেখতে চাইলাম। সে ধূর্জটিপ্রসাদের গায়ের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। সেটা ভয়ে কী না, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কলকাতার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও, এরকম জায়গায় একলা রাত্রের অন্ধকারে আসতে হলে, স্বস্তি তো পেতামই না। ভয়ও পেতাম বোধহয়। কৃষ্ট্যাল কি তার জীবনে কখনো এরকম স্থান দেখেছে বা গিয়েছে? জার্মান দেশে এরকম বস্তি এ যুগে আছে বলে বিশ্বাস হয় না। কোনো যুগেই ছিল কী না, তাও আমার জানা নেই। বিশেষ করে বার্লিন বা হামবুর্গ জাতীয় শহরগুলোর বুকে। সেই হিসেবে তাকে আমি যথেষ্ট সাহসী মেয়ে বলবো। আর ধন্য ধূর্জটিপ্রসাদ, কৃষ্ট্যালের মনে এই বিশ্বাস আর সাহস সে-ই উৎপাদন করেছে।

ঘরের মধ্যে আবার আলো জ্বলে উঠলো। দেখতে পেলাম, লোকটি ভিতরে একটি মোমবাতি জ্বাললো। সরু মোমবাতির ক্ষীণ কাঁপা-কাঁপা আলোয় ঘরটার চেহারা যেন বদলে দিল। লোকটি ডাকলো, 'আইয়ে।'

ধূর্জটিপ্রসাদ কৃষ্ট্যালকে নিয়ে আগে ঢুকলো। চৌকাট এত উঁচু, কৃষ্ট্যাল আর একটু হলে হোঁচট খেত। ধূর্জটি তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়েছিল, গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। কৃষ্ট্যালের মুখে উচ্চারিত হল, 'ধন্যবাদ!'

লোকটা বললো, 'আপলোগ বৈঠিয়ে, হম আতা হ্যায়।'

দেখলাম ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলতে একটি খাটিয়া, একটি নড়বড়ে টেবিল ও চেয়ার। কাঁচা মাটির মেঝে। নিতান্ত অগ্রহায়ণ মাস বলেই, এই চারদিক বন্ধ ঘরের মধ্যে বসা সম্ভব। দরজা বন্ধ করলে, হাওয়া চলাচলের জায়গা একমাত্র, দেওয়ালের ওপরে টালির শেড যেখানে ফাঁক হয়ে, সেখানে। বাইরে বাতাস তেমন নেই, তবু এত সরু মোমবাতি যে, তার শিখা একবারের জন্যও স্থির হচ্ছে না। আমাদের তিন জনের ছায়া কিম্ভূত ছায়া, গোটা ঘর জুড়ে কাঁপছে। খাটিয়া আর চেয়ার দেখেই মনে হল, রক্তচোষাদের মৌরসপাট্টা অধিকারের বংশপরম্পরা ঘর-গৃহস্থালি রয়েছে প্রতিটি ফাটলে, দড়ির রন্ধ্রে। আমার নিজেরই বসতে গা শিরশির করছে। মিনি স্কার্ট-পরা কৃষ্ট্যাল কী করে বসবে। রক্তচোষারা তাকে এক মিনিটও বসতে দেবে কী না সন্দেহ।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললো, 'এখনো বলো কৃষ্ট্যাল, এখানে কি তুমি বসতে পারবে? এখনো কি তোমার এদের আস্তানায় বসে চোলাই মদ পানের

উৎসাহ আছে?'

কৃষ্ট্যাল কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললো, 'নিশ্চয়ই। এ ঘরে নিশ্চয় মানুষই বসে?'

ধূর্জটি বললো, 'তা তো নিশ্চয়ই। আমি এ ঘরে বসে পান করেছি।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'তবে আমিই বা পারবো না কেন। আমি নিজের জীবনে অবিশ্যি এরকম জায়গা কখনো দেখিনি, যাইওনি। তবে কী একটা বৃটিশ ছবিতে, পুরনো লণ্ডন শহরের এরকম বস্তির চেহারা আমি দেখেছি। ঠিক এরকম বলবো না, প্রায় এরকম। তখন আমি মনে-মনে কল্পনা করেছিলাম, ওরকম একটা জায়গায় যেতে পারা, একটা থ্রিলিং ব্যাপার। এখন আমার কাছে, সেই রকম থ্রিলিং মনে হচ্ছে।'

আমি হেসে বললাম, 'হয়তো আপনি যথার্থ বলেছেন। তবু আমি একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার ভয় হচ্ছে, ছারপোকা আপনাকে এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে দেবে না।'

কৃষ্ট্যাল এবার যেন একটু ভয়ের সঙ্গে নাক কুঁচকে বললো, 'ছারপোকা আছে নাকি?'

বললাম, 'আমার সন্দেহ তা-ই।'

ধূর্জটি বললো, 'সন্দেহ না, তুমি যা বলেছ, ঠিকই বলেছ। ছারপোকা আছে, মশারাও ছেড়ে কথা বলবে না। তবে মশার দৌরাত্ম্য তেমনটা হবে না, একটু ঠাণ্ডা পড়েছে তো। খাটিয়ায় একটা কিছু পাতার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ঠিক এ সময়েই, দেওয়াল যেখানে টালির শেডের কাছে গিয়ে ঠেকেছে, সেদিকে চমকিত ভীরু চোখে তাকিয়ে কৃষ্ট্যাল জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কী?'

আমরা দুজনেই তাকিয়ে দেখলাম। আমি বললাম, 'ওটা একটা বড় ইঁদুর। ওটার জন্য ভাববেন না, ওরা আমাদের কোনোরকম বিরক্ত করবে না।'

একটা বেশ বড় ধাড়ি ইঁদুর, সেটা গর্ভবতী হলে আমি অবাক হবো না, কারণ চেহারাটা প্রকাণ্ড আর মোটা। সে তার লাল লাল চোখে, আমাদের দেখে, আবার বেশ মন্থর ভাবেই টালির ফাঁকের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ধূর্জটি জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন বোধ করছো কৃষ্ট্যাল?'

কৃষ্ট্যালের গলায় বিস্ময় আর খুশির ঝংকার, 'অদ্ভুত, বিচিত্র! আমি রীতিমতো উত্তেজিত বোধ করছি।'

কৃষ্ট্যালের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, একটা ভয়-ভয় ভাব থাকলেও, সে বিস্ময় আর উত্তেজনার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করছে। আমার চোখে, মিনি স্কার্ট-পরা একটি, পীনবক্ষ, ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্বিনী

জার্মান যুবতীকে এ-ঘরে দেখে অদ্ভুত লাগছিল। কৃষ্ট্যাল আমার দিকে চেয়ে হাসলো, বললো, 'আপনার কি অস্বস্তি হচ্ছে?'

বললাম, 'আমিও উপভোগ করার চেষ্টা করছি।'

এ সময়েই যোগীন্দর নামক সেই লোকটি এল। তার পিছনে সেই লোকটি। যোগীন্দরের হাতে এক রাশ খবরের কাগজ। বললো, 'বাবুজী, একটু হটে দাঁড়ান, আমি খাটিয়ার ওপরে খবরের কাগজ পেতে দিই, না তো খটমল কামড়াবে।'

ধূর্জটি বলে উঠলো, 'বাহ্‌ যোগীন্দর, আমরাও ভাবছিলাম।'

যোগীন্দর বললো, 'এসব কাজে আমার গল্‌তি পাবেন না বাবুজী।'

সে সমস্ত খাটিয়ার ওপরে বেশ মোটা করেই খবরের কাগজ পেতে দিল, এবং চেয়ারেও পেতে দিল। পিছনের লোকটি একটি ছিপিবন্ধ বোতল, তিনটি কাঁচের গেলাস টেবিলের ওপর রাখলো। গেলাসগুলো এত ঝকঝকে, মনে হচ্ছে, এইমাত্র দোকান থেকে কিনে ধুয়ে নিয়ে এসেছে। লোকটি সেগুলো রেখেই, আবার বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে যোগীন্দর পকেট থেকে ধূপকাটি বের করে, মোমবাতিতে জ্বালিয়ে, টেবিলের কাঠের ফাঁকে গুঁজে দিল। ধূর্জটি তাকে আর একবার বাহাবা দিল। কৃষ্ট্যালকে বললো, 'তুমি চেয়ারে বসো।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'না, আমি এই খাটিয়ায় বসবো।'

'অসুবিধা হবে না?'

'কিছুমাত্র না।'

বলে সে প্রথমে পা ঝুলিয়ে বসলো। তারপরে পা তুলে নিয়ে, জানু পেতে বসলো। তার মিনি স্কার্ট অনেকখানি উঠে গেল, এবং প্যাণ্টি দেখা গেল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করলো না। আমারই অনভ্যস্ত চোখ একটু সংকুচিত হয়। ধূর্জটি আমাকে বললো, 'তুমিও খাটিয়ায় বসো।'

আমি বললাম, 'না, আপনিই খাটিয়ায় বসুন।'

'কিন্তু কৃষ্ট্যাল তোমার সঙ্গেই কথা বলবে, একটু দূর হয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'এ আর দূর কোথায়। আমরা তো প্রায় গায়ে গায়েই সব বসে আছি। এইটুকু তো ঘর। প্রায় গুহা।'

কৃষ্ট্যাল বলে উঠলো, 'ঠিক বলেছেন, এটা একটা গুহা, আর আমরা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা-মানব-মানবী।'

ধূর্জটি তখন বোতলের ছিপি খুলে, শুঁকে, গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললো, 'কেবল আধুনিক পোশাক পরে আছি।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'বলো তো, পোশাক খুলে ফেলতে পারি।'

ধূর্জটি বললো, 'এখনো তার সময় হয়নি।'

কৃষ্ট্যাল খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমার কর্ণেন্দ্রিয় একটু যেন ঝাঁ ঝাঁ করছিল, এবং রীতিমতো শংকাবোধ করছিলাম, কৃষ্ট্যাল সত্যি ওর মিনি স্কার্ট খুলবে নাকি। তৃতীয় গেলাসে মদ ঢালবার সময়ে, আমি বললাম, 'ধূর্জটিদা, আমাকে দেবেন না।'

ধূর্জটি ধমকে উঠলো, 'থামো হে ছোকরা। দু পাতা বই লিখে ভেবেছ, অনেক কিছু করেছ। একটু মদ পান করলে অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তোমাদের মহাজনদের অনেকেই অনেক কিছু খান। একজনের কথা জানি, তোমাদের গুরুজন সাহিত্যিক, তিনি গঞ্জিকাসেবী। তাঁর সোনা-বাঁধানো গাঁজার কল্‌কে আছে।'

এমন বিস্ময়ের সংবাদ আমার জানা ছিল না। কৃষ্ট্যাল হেসে উঠলো। কারণ আমাদের সব কথাই ইংরেজিতে হচ্ছে। কিন্তু মহাজনদের ব্যক্তিগত নেশার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু আপাততঃ আজ মোগলের হাতে পড়েছি, খানা কিছু গলাধঃকরণ করতেই হবে।

যোগীন্দর চলে গিয়েছিল। অন্য লোকটি এল সোডার বোতল আর ওপ্‌নার নিয়ে। ধূর্জটি বললো, 'আমি সোডা নেব না। এটা আমার কাছে অনেকটা ভডকার মতো লাগে। ভডকা কেউ সোডা বা জল মিশিয়ে খায় না।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'তাহলে আমিও সোডা মেশাব না। আমিও নীট ভডকা খেতে ভালবাসি।'

আমি বললাম, 'আমাকে একটু সোডা দিন।'

লোকটি একটি সোডার বোতল খুলে দিয়ে চলে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলো, 'কেওয়াড়ি বন্দ্‌ কর দেগা?'

ধূর্জটি বললো, 'কোই জরুরত নহি। ইধার কিসিকো আনে মত্‌ দো।'

'কোই নহি আয়েগা,' বলে লোকটি চলে গেল।

ধূর্জটি আমার গেলাসে সোডা ঢেলে দিল। টেবিলটা এমন জায়গায়. খাটিয়ায় এবং চেয়ারে, দু জায়গায় বসেই, সমান ভাবে ব্যবহার করা যায়। ধূর্জটি আগে গেলাস তুলে দিল কৃষ্ট্যালের হাতে। কৃষ্ট্যাল বললো, 'ধন্যবাদ।'

ধূর্জটি বললো, 'আমি ভাগ্যবান।'

তারপর সে আমার হাতে গেলাস তুলে দিয়ে, নিজে নিল, এবং গেলাস-শুদ্ধ হাত তুলে বললো, 'কৃষ্ট্যালের কলকাতা দর্শনের সাফল্য কামনা করে।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'এবং তোমাদের মতো বন্ধু পাবার গৌরবে।'

দু আউন্সের মতো পানীয়, ধূর্জটি ঢক করে এক চুমুকেই গিলে ফেললো। কৃষ্ট্যাল ছোট চুমুক দিতে যাচ্ছিল, বলে উঠলো, 'ওহ্, প্রকৃতই রুশদের ভডকা পানের স্টাইল?'

বলে সেও এক ঢোকে সবটা পানীয় গলায় ঢেলে দিল। প্রায় মিনিট খানেক দুজনেই সামলে নিল। বোঝা গেল, দেশীয় চোলাইয়ের ছোবলটা বোধহয় রুশীয় ভডকার থেকে একটু বেশী জোরালো। ধূর্জটি মোটা গলায় বললো, 'জিনিসটি ভালো।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'অপূর্ব!'

আমিও তখন সোডা মেশানো পানীয়তে ছোট করে চুমুক দিয়েছি। একটি তরল আগুনের স্রোত যেন গলা দিয়ে পাকস্থলিতে নেমে গেল। কৃষ্ট্যাল তার ব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, সিগারেট ধরালো। ধূর্জটি লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল, এবং নিজেও একটি ধরালো। কৃষ্ট্যাল মাফ চেয়ে তাড়াতাড়ি আমার দিকেও সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। ভাজা তামাকের রাজা মাপের বিদেশী সিগারেট। আমার কাছে যথেষ্ট নরম লাগলো।

দেশীয় চোলাইয়ের ঝলক লেগে গেল কৃষ্ট্যাল আর ধূর্জটির গালে। সেটা এক ঢোকে পানের জন্য বোধহয়। কৃষ্ট্যাল আমাকে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললো, 'আপনি তো দেখছি, পার্টিতে বসে যেন হুইস্কি পান করছেন।'

বললাম, 'সবাই সব কিছু পারে না, সেজন্য ক্ষমা করবেন।'

কৃষ্ট্যাল ওর গাঢ় খয়েরি চোখের তারা, যা এখন দীপ্ত মণির মতো দেখাচ্ছে, ঘুরিয়ে ঠোঁটের কোণে হেসে বললো, 'আপনি আপনার পারার ব্যাপারটা সব জানেন তো? আপনারা বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা প্রথম দর্শনে সব সময়েই একটু বেশি বিনীত এবং লাজুক। এমন কি ধূর্জটিও তা-ই। প্রথম আলাপের দিন ও এত ভদ্র আর লাজুক ছিল, ওর আসল চেহারাটা চিনতে আমার একটু সময় লেগেছিল।'

আমি হেসে বললাম, 'ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র আর আমি, আকাশ-পাতাল তফাত।'

ধূর্জটি বললো, 'বাজে বকো না হে। মনে রেখো, তোমার কিছু কিছু বই আমি পড়েছি। তুমি একটু বেশি বিনীত তো বটেই, কিছুটা ছলনাও আছে। তোমার অভিজ্ঞতা আর সাহস যে কিছু কম, আমি তা মোটেই মনে করি না।'

কৃষ্ট্যাল হেসে উঠলো, 'আপনার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারি, আপনি যতোটা নিরীহের ভঙ্গি করছেন, ততোটা নন।'

আমি হেসে ফেললাম। ধূর্জটি তার এবং কৃষ্ট্যালের গেলাসে আবার পানীয় ঢাললো। আমি কৃষ্ট্যালকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতায় কী কী দেখলেন?'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'ম্যাক্সমূলার ভবনের কথা ছেড়ে দিন, ওটা তো একটা নিয়মমাফিক ব্যাপার। ওখানে আপনাদের কলকাতার কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আপনাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি দেখেছি। কিন্তু আমার ভালো লেগেছে কালীঘাটের মন্দির, কেওড়াতলা শ্মশান, নিমতলা শ্মশান, প্রাচীন গঙ্গা, বড় গঙ্গা। অবিশ্যিই পুরনো উত্তর কলকাতা আমার বেশী ভালো লেগেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছি।'

ধূর্জটি বললো, 'আগে চুমুক দিয়ে নাও।'

দুজনে এক সঙ্গে, আগের মতোই এক ঢোকে পানীয় গিলে ফেললো। নতুন করে সিগারেট ধরালো। কৃষ্ট্যাল আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে আর কোথায় কোথায় যেতে বলেন?'

আমি বললাম, 'কলকাতার কথা আমি কিছু বলতে পারি না। আপনি নিশ্চয়ই একবার শান্তিনিকেতনে যাবেন?'

'ওহ্, নিশ্চয়ই। আমার প্রোগ্রাম আছে, ডিসেম্বর মাসে আমি সেখানে যাব। শুনেছি, সেখানে সে সময়ে কি একটা উৎসব হয়।'

'হ্যাঁ, বাঙলা মাসের ৭ই পৌষ মেলা হয়। আপনি সেটা উপভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া, আপনার কী বিষয়ে ইণ্টারেস্ট আছে, জানলে আমি কিছু বলতে পারি।'

'আমি আপনাদের দেশের জনমানসকে বুঝতে চাই, কিন্তু বর্তমানের এই আধুনিকতাকে না, তার পশ্চাদপট এবং সূত্রগুলোকে যাতে ধরতে পারি, সেরকম কিছু দেখতে বা শুনতে চাই। অবিশ্যি সেই সঙ্গে বইয়ের সাহায্য নিশ্চয়ই নেব।'

কৃষ্ট্যালের কথা শুনে, ওকে আমি কেঁদুলির জয়দেবের মেলার কথা বললাম। নানুর এবং ছাত্না দেখতে বললাম, এবং দুই চণ্ডীদাসের বিতর্কের বিষয়েও বললাম। তাছাড়া, অট্টহাসের মন্দির কী, বুঝিয়ে দিয়ে, সেখানেও যাবার পরামর্শ দিলাম, সেই সঙ্গে উদ্ধারণপুরের ঘাট। শাক্ত, বৈষ্ণব এবং বাউল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে, কৃষ্ট্যাল আমার সঙ্গে আলোচনায় বেশ মশগুল হয়ে গেল। ওর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসায়, আমিও উৎসাহিত হয়ে অনেক কথা বললাম। স্বাভাবিক ভাবেই যোগ-সাধনার কথা উঠলো। আমাদের এই সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ধূর্জটি নিজেকে এবং সবাইকে পানীয় পরিবেশন করে চলেছে, যদিও আলোচনা সে মনোযোগ দিয়েই

শুনেছিল। আমি যখন চণ্ডীদাসকে যোগী বলে উল্লেখ করলাম, তখন সে একটু অবাক হল। আমি তাকে জানালাম, চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী বাশুলীর সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কোনো যোগ নেই, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে সেখানে চণ্ডীদাস কবি। কিন্তু তাঁর কিছু কবিতা আছে, যা দুর্বোধ্য এবং একান্তই দেহতত্ত্ব, যথা, 'ভেকের মুখেতে সাপেরে নাচায়।' কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেহের এবং যোগের কথা উঠলো। যোগের সঙ্গে যোগাসনের কথা উঠলো, এবং স্বভাবতঃই প্রাণায়ামের প্রসঙ্গও বাদ গেল না।

কৃষ্ট্যাল জিজ্ঞেস করলো, 'যোগাসনের একটা কিছু আসন আমাকে বলতে পারো?'

আমি তাকে পদ্মাসনের কথা বললাম। কৃষ্ট্যাল হঠাৎ আমার হাত টেনে ধরে বললো, 'আমাকে একটু পদ্মাসন দেখিয়ে দাও।'

চোলাই রসের ক্রিয়া এখন কৃষ্ট্যালের রক্তাভ মুখে, দীপ্ত মণি চোখেই শুধু না, তার কথার আবেগে, এবং শরীরের উষ্ণতা ও চঞ্চলতায়। ধূর্জটির তেমন না হলেও, সেও বেশ মেতে উঠেছে। বললো, 'দেখ তো, তুমি না থাকলে কে ওর সঙ্গে এত বকবক করতো? আমি এসব জানি না। এবার পদ্মাসন করে দেখাও।'

কথাটা কতোখানি সত্যি, জানি না, কারণ ধূর্জটিকে বোঝা মুশকিল। সে আমাকে ছলনাময় বলেছে, আমার মনে হয়, সে নিজেও কিছু কম যায় না। কৃষ্ট্যাল আবার আমাকে হাত ধরে টেনে বললো, 'দেখাও না।'

কৃষ্ট্যাল এখন আমাকে 'তুমি' করে বলছে। আমি অসহায় ভাবে হেসে বললাম, 'এ-ভাবে পদ্মাসন দেখানো যায় না। তাছাড়া আমি পারবোও না।'

কৃষ্ট্যাল ছোট মেয়েটির মতো আবদার করে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই পারো, আমাকে একটু দেখাও।'

কী বিপদ! আচ্ছা পাগল মেয়ের পাল্লায় পড়া গিয়েছে। হঠাৎ ধূর্জটি বললো, 'আমি দেখাচ্ছি, দেখ।'

বলে, আমাকে অবাক করে দিয়ে, খাটিয়ার ওপর বসেই, ধূর্জটি পদ্মাসন করে বসলো। তার এই চল্লিশের হাড়ে যে এত ক্ষমতা এখনো আছে, আমার অবিশ্বাস্য মনে হল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তার কষ্ট হচ্ছে, তবু সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য। জিজ্ঞেস করলো, 'হয়েছে?'

আমি বললাম, 'অপূর্ব। আপনি কি অভ্যাস করেন নাকি?'

'মাথা খারাপ।'

হঠাৎ দেখি, কৃষ্ট্যাল ধূর্জটিকে অনুকরণ করে পদ্মাসনের চেষ্টা করছে। তার সুবর্ণমণ্ডিত বিশাল ঊরু ও জংঘা কিছুতেই মুড়ে, পা টানতে পারছে না। মিনি স্কার্ট উঠে গিয়েছে প্রায় কোমরের কাছে। পর

মুহূর্তেই ‘উহ্’ বলে একটি আর্তনাদ করে, খিলখিল করে হেসে, খাটিয়ার ওপরে গড়িয়ে পড়লো। মাথাটা ঝুলে পড়লো খাটিয়ার বাইরে, এবং সোনালি চুলও ঝুলে পড়লো। বললো, ‘ওহ্ ধূর্জটি!’

ধূর্জটি তাড়াতাড়ি ওকে টেনে তুললো। কৃষ্ট্যাল ধূর্জটিকে একেবারে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ‘অসম্ভব। তোমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।’

বলে অনায়াসে ধূর্জটির ঠোঁটে চুমো এঁকে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, ‘তুমি আমাকে যা যা বললে, এসব বিষয়ের ওপরে একটি ইংরেজি বইয়ের তালিকা লিখে দেবে।’

বললাম, ‘নিশ্চয়ই দেব।’

ধূর্জটির কোলের ওপর কৃষ্ট্যালের একটি হাত। সে চুপ করে মাটির দেওয়ালের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আস্তে আস্তে ওর মুখের ওপর যেন বিষণ্ণ কাতরতা নেমে এল। নিচু স্বরে, খানিকটা আপন মনে বললো, ‘আমার মনে হয়, তোমাদের দেশের মানুষেরা এখনো যেন কোথায় নিজেদের মধ্যে একটা মাখামাখি করে আছে। আমরা যে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতায় ভুগছি, তা এখনো তোমাদের যেন তেমন করে স্পর্শ করেনি।’

ধূর্জটি বললো, ‘তোমার এ কথাটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না।’

কৃষ্ট্যাল বললো, ‘তুমি তো একটা শহুরে হোক্স।’

ধূর্জটি রাগ করলো না, বরং একটু হাসলো। তার হাসির মধ্যে যেন একই সঙ্গে বিদ্রুপের ঝিলিক, এবং বিমর্ষতার ছায়া দেখা গেল। বললো, ‘তা তুমি আমাকে যা খুশি বলতে পারো, আমি তর্ক করবো না। কিন্তু...।’

কৃষ্ট্যাল ধূর্জটির একটা হাত টেনে নিজের বুকের ওপর চেপে বললো, ‘রাগ করেছ ধূর্জটি?’ ধূর্জটি তার সেই হাতটা দিয়েই, কৃষ্ট্যালের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললো, ‘না, তোমার ওপরে আমি কখনোই রাগ করবো না। আমি তোমার বা তোমাদের যন্ত্রণাটা বুঝি। কিন্তু আমরা আজকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছি না, তা পুরো সত্যি না। আমরাও আজ বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত, বিশেষ করে শহরের মানুষরা তো বটেই, মনে হয়, গ্রামের লোকেরাও এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। কারণ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম বলতে একদা যা বোঝাতো, আজ আর তার কোনো অস্তিত্বই নেই। তুমি বলছো বটে মাখামাখি। রাজনৈতিক দলগুলোর কথা আমি বলতে পারি না, তারা কতোখানি এক মন, এক প্রাণ। তবে তাদের এক মন ও এক প্রাণ সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাই হোক, আমি এত কথা বলতে চাই না কৃষ্ট্যাল। সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করো,

ভারতবর্ষের মানুষ বিচ্ছিন্নতার কথা জানতো না বটে. নিঃসঙ্গতার কথা তারা জানে বহু যুগ থেকে।'

কৃষ্ট্যাল আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি মনোযোগ দিয়ে ধূর্জটির কথাগুলো শুনছিলাম। এই ধূর্জটির পরিচয় হয়তো অনেকেই জানে না। জীবন সম্পর্কে যে এই সব চিন্তা করে। সে সাধুতার ভান করে না, বড় বড় কথা বলে না, এবং এখন সে যা কিছু বলছে, তার অনুভূতি এবং বিশ্বাস থেকেই বলছে। তার কথা অস্বীকার করারও কোনো কারণ দেখি না। আমি কৃষ্ট্যালকে বললাম, 'ধূর্জটিদার কথা সত্যিই। সমাজে এবং গৃহের নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে, ভারতবর্ষের মানুষ অরণ্যের নিভৃতে চলে গিয়েছে। নিঃসঙ্গতার বেদনাকে ভোলবার জন্য, ভারতবর্ষের মানুষ বেদনার মধ্যে একটা আনন্দানুভূতিকে খুঁজতে চেয়েছে, খুঁজেছে, পেয়েছেও। পশ্চিমের সঙ্গে, সেখানেই আমাদের তফাত।'

কৃষ্ট্যাল জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু এখনকার মানুষও কি তার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য অরণ্যে যায়?'

আমি বললাম, 'না। সেই হিসাবে, এ যুগের নিঃসঙ্গতার বিষয়টা, সারা পৃথিবীতে প্রায় একরকম। অবস্থাভেদে কিছুটা হয়তো ভিন্ন। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই একরকম লোকের দেখা পাওয়া যাবে, যে মোটেই একজন ভিক্ষুক মাত্র না। সে বিশেষ তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী এবং সাধক, কিন্তু ভিক্ষান্নে শারীরিক ভাবে বাঁচেন, বাস করেন গ্রামের প্রান্তে গাছতলায়। কিন্তু তাঁর মুখে এমন প্রসন্ন শান্ত হাসি আপনি দেখতে পাবেন, মনে হবে সেই ব্যক্তি বোধহয় স্বর্গের সন্ধান জানেন। নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি জগতের এক বিশেষ সান্নিধ্যকে খুঁজে পেয়েছেন।'

কৃষ্ট্যালের আরক্ত মুখে সোনালি চুল এলিয়ে পড়েছে। ওর গাঢ় খয়েরি দীপ্ত চোখের তারায় এক গভীর জিজ্ঞাসা। যেন ওর ভাবনা বহু দূরে চলে গিয়েছে। অস্ফুটে বললো, 'আমি এসব বুঝতে পারি না।'

ধূর্জটি বললো, 'কে তোমাকে পারতে বলেছে। গোটা জীবনটা জ্বলতে জ্বলতে, এক সময়ে সে একটা কিছু খুঁজে পাবেই, ভাবছো কেন। আমার এক বন্ধু, তোমাদের পাশের দেশের, মানে ফ্রান্সের একটা এ্যাসট্রে দিয়েছিল। সেই এ্যাসট্রের বুকে ফরাসী ভাষায় লেখা ছিল, "আমাকে জ্বলতে দাও।" এ তো তোমাদের পশ্চিমী শিল্পীরই কীর্তি।'

কৃষ্ট্যাল বলে উঠলো, 'সুন্দর।'

ধূর্জটি আবার বললো, 'আর আমাদের এক কবি গেয়েছেন, "আরো আরো আরো, আমায় মারো।"'

কৃষ্ট্যাল যেন একটা যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি করলো, 'আহ্!'

ধূর্জটি গেলাসে পানীয় ঢেলে, কৃষ্ট্যালকে দিয়ে, নিজে গলায় ঢাললো। তারপরে দু হাত তুলে বললো, 'আর আমি কী বলি জানো?'

বলেই গলা তুলে, বাঙলায় চিৎকার করে গেয়ে উঠলো—

'কী হবে কী হবে
ভেবে ভেবে এ ভবে।
তুমি যে ভবের খেলনা
মিটিবে না হে মিটিবে না
এ ভব যাতনা।'

আমি ভয় পেলাম, এখুনি লোকজন ছুটে আসবে। ধূর্জটি এত জোরে গেয়ে উঠলো, বোধহয় গোটা পাড়ায় শোনা গিয়েছে। এবং এলও, যোগীন্দর এসে দরজায় দাঁড়ালো। ধূর্জটি জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে যোগীন্দর? পুলিস এসেছে?'

যোগীন্দর বললো, 'না বাবুজী।'

ধূর্জটি বললো, 'এলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

যোগীন্দর বললো, 'ওসব আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি তো এখানকার সেই চাপ খেতে ভালবাসেন। খাবেন, নিয়ে আসবো?'

ধূর্জটি লাফিয়ে উঠলো, 'আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে। শালপাতায় করে তিন জনের জন্যই নিয়ে এস। মেমসাহেব খায় তো খাবে, তা না হলে আমরাই খাবো।'

বলে পকেট থেকে পার্স বের করে, দরজার কাছে টাকা ছুঁড়ে দিল। যোগীন্দর টাকা নিয়ে চলে গেল। কৃট্যাল বললো, 'ধূর্জটি, তোমার গানের মানে আমি বুঝতে পারলাম না।'

'সাহিত্যিককে বলো, অনুবাদ করে বলে দেবে।'

কৃষ্ট্যাল আমার দিকে তাকালো। আমি ধূর্জটির গানের লাইনগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলে দিলাম।

কৃষ্ট্যাল ধূর্জটিকে জড়িয়ে ধরে আর একবার চুম্বন এঁকে দিল। ধূর্জটি বললো, 'আমাকে উত্তপ্ত করে ফেলছো।'

কৃষ্ট্যাল বললো, 'আমিও উত্তপ্ত। কিন্তু ধূর্জটি, তোমার গান শুনে আমার একটা কথা মনে হল।'

'কী বলতো?'

'তুমি যেন চিৎকার করে কাঁদছিলে।'

ধূর্জটি হা হা করে হেসে উঠলো। বললো, 'আমার গানকে তোমার কান্না বলে মনে হল?'

'হ্যাঁ, আমি জানি, ওসব উত্তাপ বলে কিছু না, তুমি কেঁদে মরছো।'

'তুমি একদম প্যানপেনে বাঙালী মেয়েদের মতো কাব্যি করছো। তোমার এই সোনার মতো উরুস্তম্ভ আর পীন বুকে এত আগুন আছে, আমি তাতেই জ্বলে পুড়ে মরতে চাই।'

'মরো। তুমি মরেছ ইতিমধ্যেই, আরো মরতে চাও, মরো। হয়তো আমার মনের কথাও তাই। কিন্তু মরেও যা খুঁজছো, তা তুমি পাবে না।'

'কী খুঁজছি আমি?'

কৃষ্ট্যাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তা যদি জানতাম। তোমাদের ইণ্ডিয়াতে খুঁজে দেখি, জানতে পারি কী না, মেলে কী না।'

ধূর্জটি হাত নেড়ে বাঙলায় বললো, 'নাই নাই, সে পথিক নাই/প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, রুধিল না সমুদ্র পর্বত/তাই তার রথ/চলিয়াছে অনন্তের পথে...'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, 'কী সাহিত্যিক, ঠিক বলছি না ভুল বলছি।'

হেসে বললাম, 'ঠিক আছে।'

'তুমি একটু কৃষ্ট্যালকে ইংরেজিতে কবিতাটার কথা খালি বলে দাও।'

আমি রবীন্দ্রনাথের শাহজাহান কবিতার কথা এবং উক্ত পংক্তিগুলোর অনুবাদ করে দিলাম। ধূর্জটি বললো, 'এজন্য বললাম, কৃষ্ট্যাল, জানবার এবং পাবার জন্য ভারতবর্ষের দরকার হয় না। তবে তুমি ভারতবর্ষে এসেছে, তোমাকে স্বাগতম জানাই।'

বলেই সুর করে গেয়ে উঠলো, 'এসো এসো বঁধু, আমারি আঙিনায় এসো।'

ধূর্জটি বেশ মেতে উঠেছে। সে একেবারে মাতাল হয়ে গিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। সে যে ভাবে গান গেয়ে উঠলো, তা মাতালের বেসুরো বা জড়ানো গান না। একেবারে পাকা কীর্তনের সুরেই সে কলিটি গাইলো। কৃষ্ট্যাল আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি ওকে গানের লাইনটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিলাম। শুনেই, কৃট্যাল আবার ধূর্জটির ঠোঁটে আগ্রাসী চুম্বনে তাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি একবার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেখানে অন্ধকার। যদিও তাকিয়ে দেখে কোনো লাভ নেই। কারণ সে সংকোচের জন্য দেখা, তা আমার যা-ই থাকুক, যাদের জন্য সংকোচ, তাদের কিছুই যায় আসে না। একবার মনে হল, আমার বোধহয় এ আসর ত্যাগ করার সময় হয়েছে।

কৃষ্ট্যাল বললো, 'ধূর্জটি, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি।'

ধূর্জটি বললো, 'না বোঝবার মতো কোনো কথা আমি বলিনি। তুমি নিজেও ভালো জানো, যা চাইছো, তার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও

পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তোমার ঘরের কোণে বসেই, তুমি এমন কিছু অবিষ্কার করতে পারো, যা তোমাকেই অবাক করে দেবে।'

কৃষ্ট্যাল জিজ্ঞেস করলো, 'ধূর্জটি, তুমি কি ঈশ্বরের কথা বলছো?'

ধূর্জটি জোরে মাথা নাড়িয়ে বললো, 'না না না, এ সব অধ্যাত্ম বোধের বালাই আমার নেই। তুমি যে-ই হও, বিদেশিনী বিদুষী, কিন্তু তুমি আমার কাছে একান্তই একটি নারী। অবিশ্যিই তোমার গুণের মূল্য আমি দেব, তোমার চিন্তা-ভাবনাকে আমি শ্রদ্ধা করবো, কিন্তু চিরন্তন সেই নারী রূপেই, পুরুষ হিসাবে তোমাকে আমি পেতে চাইবো। অধ্যাত্ম-টধ্যাত্ম আমার নেই। আমি তমসার মানুষ, পূর্ণ তামসিক। রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে পছন্দ করেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের ঠোঁটকাটা কথা তাঁর ভালো লাগেনি, তাই বলেছিলেন, "বাবা যা খাচ্ছো, তারই ঢেঁকুর তুলছো?" রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়েছিলেন। আমাকেও তাই বলতে পারো, যা খাই, তারই ঢেঁকুর তুলি। তবে এই যে আমাদের সাহিত্যিক, ও আমাকে দাদা বলে, কারণ আমি ওর থেকে দু-তিন বছরের বড়, কিন্তু এখন ওকে আমার শালা বলতে ইচ্ছা করছে।'

ধূর্জটি রক্ত চক্ষু মেলে, আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। আমি মনে মনে একটু প্রমাদ গণছি। ধূর্জটিপ্রসাদের শ্যালক হবার কোনো বাসনা আমার নেই, ভয় হচ্ছে এই ভেবে, মত্ততা কতো ডিগ্রিতে, কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে। যদিও তার মাতাল হাসিটি বেশ প্রসন্নই বলা যায়। বললো, 'এই শালা তখন একটা কথা বলেছে, আমার মাথায় বিঁধে আছে। ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকা, গ্রামের বাইরে গাছতলায় বসে থাকা সেই প্রাজ্ঞ প্রসন্ন মানুষের কথা আমি ভুলতে পারছি না। সাহিত্যিক, তুমি কী ভেবে কথা বলেছ? সেই সব মানুষ কি ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে?'

বললাম, 'তা আমি জানি না। তবে তারা মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতে যায় না। ফোঁটা তিলক কেটে জপ-তপও করতে দেখা যায় না।'

ধূর্জটি জিজ্ঞেস করলো, 'তারা কি স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে না?'

বললাম, 'হ্যা, তাও করে। অনেক সময় তাদের যুগলেও দেখা যায়। কিন্তু তারা বসে কথা বলছে, এমন বড় একটা দেখিনি। হাসি কথাবার্তা, গৃহস্থের ঘরে যা দেখা যায়, সেরকম কখনো দেখিনি।'

কৃষ্ট্যাল জিজ্ঞেস করলো, 'এরকম মানুষ তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি। দেখেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা চুপ করে বসে আছে। গ্রামের প্রান্তে মাঠ যেমন নিঃশব্দ, তারাও তেমনি। তারা সুখী কি দুঃখী, কিছুই বোঝা যায় না। জীবধর্মের ব্যাপারগুলো তারা পালন করে। সেটা বোঝা

যায়, কেন না, তারা আগুন জ্বালে, হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে খায়, ঘুমোয়। কৌতূহল বশতঃই আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, শোনবার চেষ্টা করেছি, তারা কোনো কথা বলে কী না। কথা বলতে শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না।'

কৃষ্ট্যাল যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, অথবা সেটা মদেরই ক্রিয়া, আমি জানি না। গভীর কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা ওর, 'তুমি ওদের সঙ্গে কখনো কথা বলেছ?'

'বলেছি।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?'

'বলেছে। জিজ্ঞেস করেছি, সে কোন্ ধর্ম সম্প্রদায়ের। জবাব পেয়েছি, "সব সম্প্রদায়েরই বলতে পারো, আবার কোনো সম্প্রদায়েরই না, বলতে পারো।" জিজ্ঞেস করেছি, "তবে আপনি কী করেন?" জবাব পেয়েছি, "গাছতলায় বসে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছি।" কিন্তু তাতে মন শান্ত হয় না। জিজ্ঞেস করেছি, "আপনি কী ভাবেন?" জবাব, "কী ভাববো বাবা? ভাববার ধন আমি পেলাম কোথায়? আমি কেবল বোঝবার চেষ্টা করছি।" জিজ্ঞেস করেছি, "সেটা কী?" হাসির সঙ্গে জবাব পেয়েছি, "জগৎ সংসারের এত যে মজার খেলা, এ খেলাটা চলছে কেমন করে।" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছি, "মজার খেলা? সেটা আবার কী?" হাসির সঙ্গে দেখেছি তখন চোখেও ঝিলিক। জবাব পেয়েছি, "ওটা নিজে ভেবে দেখো, ওটা বোঝানো যায় না। তোমাকে তো আগেই বলেছি বাবা, ভাববার ধন আমি পাইনি। তেমনি সংসারে লোকে যেমন বলে, সব বোঝানো যায়, আর বোঝবার জন্য যাঁরা অনেক তত্ত্ব পথ্য দেয়, আমি তাদের কেউ না। আমি কেবল দেখছি, আর বোঝবার চেষ্টা করছি।" এর বেশি জবাব পাইনি।'

এ সময়ে যোগীন্দর শালপাতায় করে চাঁপ নিয়ে এল। গন্ধটা ভালোই লাগছে, রঙটাও মন্দ না, এবং শুকনো, কোনো তরল পদার্থ নেই। তবু খোলা শালপাতায়, এই চাঁপ খেতে তেমন ভরসা পাচ্ছি না। তবে বেশ গরম, এখনো ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু ধূর্জটির মিনিট খানেক কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কৃষ্ট্যাল আমাকে বললো, 'আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

ধূর্জটি মোটা গম্ভীর স্বরে বললো, 'বুঝেছি, আমিও বলবো না। কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছে, কী একটা গভীর রহস্য যেন উঁকি দিচ্ছে। জগৎ সংসারের মজার খেলাটা চলছে কেমন করে, এই ভেবে ভেবেই জীবন কেটে যাচ্ছে। এবার ভাবো, সেই মজার খেলাটা কী? দেখবে? আমি দেখাবো?'

আমি আর কৃষ্ট্যাল দুজনেই ধূর্জটির দিকে তাকালাম। ধূর্জটি বললো, 'এই দ্যাখো।'

বলে শালপাতা থেকে মাংসের চাঁপ তুলে চিবোতে আরম্ভ করলো। মুখে মাংস নিয়েই বললো, 'খাও খাও, বড় সুন্দর করেছে। কলকাতার নামী-দামী রেস্তোরাঁয় এমন জিনিস হয় না।'

বিদেশিনী মেমসাহেব কৃষ্ট্যাল অনায়াসে চাঁপ তুলে নিয়ে, দু হাত দিয়ে ধরে, ওর রক্তিম হাঁ মুখে পুরে দিল, দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়তে লাগলো। গন্ধ এবং রঙ আমাকেও আকৃষ্ট করলো। তুলে নিলাম, মুখে দিয়ে সত্যি মনে হল, এর স্বাদ গ্রহণ না করলে, জীবনে একটি খাদ্য থেকে বঞ্চিত হতাম। বললাম, 'কিন্তু খেলাটা কী দেখাবেন বলছিলেন যে?'

ধূর্জটি বললো, 'এই তো খেলা। এই আমরা যা করছি। ভালো মন্দ, মানুষ যা করছে, আর এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড চলছে, এ সবই তো মজার খেলা।'

বলে সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো। তারই রুমালটা কৃষ্ট্যাল টেনে নিয়ে নিজের মুখ মুছলো। ধূর্জটি বললো, 'কিন্তু এসব ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাবো। এমন নির্বিকার সাধক হওয়া কঠিন। এরা বক্তৃতা দেয় না, এদের কথা কেউ লিখবে না। সাহিত্যিক, তুমি যদি পারো লিখে যেও। ঘুণপোকা যেমন কাট কাটছে ভিতরে ভিতরে, আর কিছু জানে না, এরা সেই রকম। কিন্তু আমার জীবনে এমন দিন কি আসবে?'

বলেই সে যোগীন্দরকে ডাকলো। যোগীন্দর কাছে-পিঠেই ছিল। এসে বললো, 'বলুন বাবুজী।'

ধূর্জটি বললো, 'মাল তো ফুরিয়ে গেল, মাল দাও। আর আমাকে একটু প্রেমসপ্তমী দাও।'

যোগীন্দর গোঁফ ছড়িয়ে হেসে বললো, 'জরুর বাবুজী।'

বোঝা গেল, পান এখনো চলবে। কিন্তু প্রেমসপ্তমীটি কী? কৃষ্ট্যাল হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে, হাত টেনে ধরে বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে সব ঘুরে দেখতে চাই।'

ধূর্জটি বললো, 'ঠিক কৃষ্ট্যাল, ঠিক লোককে ধরেছ। যদি পারো. ওকে পাকড়ে নিয়ে চলে যাও। আমার মতো স্টীল আর পেট্রলের কারবারি দিয়ে তোমার কোনো উপকার হবে না। আমি বড় জোর. ক্ষণিকের তৃপ্তি দিতে পারি।'

আবার আমাকে নিয়ে কেন। জানি ধূর্জটি বর্তমান যুগের দুটি মোক্ষম বস্তুর কারবারি,—স্টীল আর পেট্রল। কিন্তু তার যে-সব ক্ষমতা আছে, আমার তা নেই। আমার ঘোরাটা, একান্তই আমার নিজের মতো। তখন আমি সাহিত্যিকও না। কৃষ্ট্যালকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো। দেখছি কৃষ্ট্যাল আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

আছে। ওর বুকের অনেকখানি কাটা জামার ফাঁক দিয়ে. স্তনের অনেকখানি দৃশ্যমান। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, এখন কৃষ্ট্যালকে বোধহয় বুঝিয়ে কিছু বলে নিরস্ত করতে পারবো না। বললাম, 'চেষ্টা করবো।'

'নিশ্চয়ই ?'

'নিশ্চয়ই।'

কৃষ্ট্যাল আমার গালে একটি চুমো এ'কে দিয়ে বললো, 'খুব ভালো ছেলে। আমি তোমাকে নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু তুমি আমাকে কিছু দেখাও।'

ধূর্জটি বললো, 'ভুল বললে কৃষ্ট্যাল। ওকে আমি এমনি এমনি শালা বলিনি। ও একটি ঘুঘু বুঝলে? ও হচ্ছে, গাছতলার সেই লোকটি, ছদ্মবেশ ধরে আছে। তা না হলে, আমাদের ওসব কথা শোনায়? বিশেষ করে আমার মতো লোককে? যে সন্ধ্যের পরে মদ আর মেয়ে ছাড়া কিছু জানে না। ব্যাটা আজ আমার সন্ধ্যেটাই মাটি করলো।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। আমি বরং এবার চলি, আপনারা বসুন।'

ধূর্জটি গর্জন করে উঠলো, 'চোপ! বসো।'

কৃষ্ট্যাল হেসে উঠে, আমাকে আরো জোরে চেপে ধরলো. এবং আমার শ্রবণেন্দ্রিয় প্রায় পুড়িয়ে দিয়ে বললো, 'বন্ধু, আজ আমরা যা করবো, তিনজনে একসঙ্গে করবো। এমন কি নগ্ন হতে হলেও, তিনজনে একসঙ্গে নগ্ন হবো।'

'অপূর্ব!' বলেই ধূর্জটি মুখ বাড়িয়ে, কৃষ্ট্যালের কাঁধের কাছে চুমো খেল।

এ সময়ে নতুন পানীয়ের বোতল এল। ঢালা হল, গলাধঃকরণ হল। আমি কতোটা এদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছি, জানি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, অসুখী মানুষদের প্রমোদ-আসরে বসে, দুজনের প্রতিই আমার প্রীতি বাড়ছে। আমার নিজের সত্তার ধ্বনিটা এখানে কতোখানি সুরে তালে মিলছে, বুঝতে পারছি না। আমার ভিতরে কোথাও বিরূপতা নেই।

ধূর্জটি এ সময়ে কাঁচা মাটির দেওয়ালে হেলান দিয়েছিল। সে অবস্থাতেই বললো. 'বুঝলে সাহিত্যিক, অগণিত দরিদ্র মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যদি কথা বলতাম, আমাকে সবাই জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দিতো, না হয় মেরে ফেলতো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কৃষ্ট্যাল একটা ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে এসেছে। কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য আর বৈষম্যের কোনো তুলনা হয় না। তবু ভাই, তুই বিশ্বাস কর, আমি একটা

ভিক্ষুক, কিন্তু আমার এক কণা ভিক্ষান্নও জোটে না।'

ধূর্জটির গলার স্বর যেন কোলা ব্যাঙের মতো গোঙানো শোনাচ্ছে, আর তার রক্তাভ চোখ দুটি যেন ছলছল করছে।

এ সময়েই যোগীন্দর এল, বললো, 'নিন বাবুজী।'

যোগীন্দরের হাতে গাঁজার কল্‌কে। দেখে আমার চক্ষুস্থির। মনে পড়ে গেল, সাধু-সন্তরা তাঁদের ভাষায়, গাঁজাকে **'সপ্তমী'** বলেন। প্রেম-সপ্তমী তাহলে এই? ধূর্জটি বললো, 'এনেছ? দাও।'

কল্‌কে নিয়ে, ধূর্জটি সুর করে গেয়ে উঠলো,

'এসো ভাই, প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
এ গাঁজা যে খেয়েছে, সে জেনেছে
প্রেমের রসে ভিয়েন করে, প্রেমে মজেছে।'

বলেই, কলকে বাগিয়ে ধরে, জোরে দম দিল। কলকেতে দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠলো। কৃষ্ট্যাল অবাক হয়ে ধূর্জটিকে দেখছিল। ধূর্জটির কোলের ওপর তার হাত। যোগীন্দর বলে উঠলো, 'বাবুজী গুরুদেব লোক।'

বলে সে কলকেটা নিতে গেল। কৃষ্ট্যাল নিজের হাতে নিয়ে বলে উঠলো, 'ওহ্‌, না, আমি চেষ্টা করবো।'

ধূর্জটি কোনো কথা বললো না। যোগীন্দর কলকেতে আঙুল টিপে ঠিক করে দিল। কৃষ্ট্যাল টানবার চেষ্টা করলো। পারলো না, ধোঁয়া ঢুকলো ওর মুখে। তখন যোগীন্দর কলকে ধরার পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিয়ে, কোথায় মুখ রেখে টানতে হবে, বলে দিল। কৃষ্ট্যাল সেই পদ্ধতি অনুযায়ী টান দিল।

প্রথমেই জোরে টান দিল, আর গলায় খক্‌ করে শব্দ করে, মুখ থেকে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল। ওর মুখও একটু বিকৃত হয়ে উঠলো।

ধূর্জটি আরক্ত চোখ মেলে তাকালো, বললো, 'কৃষ্ট্যাল গাঁজা টেনেছে বুঝি?'

আমি তখন কৃষ্ট্যালের কাঁধে হাত দিয়েছি। কৃষ্ট্যাল আমার সেই হাতটা টেনে একবার ওর গলায় আর একবার বুকে চেপে ধরলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কষ্ট হচ্ছে?'

কৃষ্ট্যাল মাথা নেড়ে, রুদ্ধ স্বরে বললো, 'না।'

যোগীন্দর বুদ্ধিমান। সে তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল নিয়ে এসে আমাকে বললো, 'মেমসাহেবকে পিলিয়ে দিন, ঠিক হয়ে যাবে।'

কৃষ্ট্যালকে জল দিলাম, ও পান করলো। একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'ঠিক আছে।'

ধূর্জটি বললো, 'কলকেটা কোথায় গেল?'

সেটা তখন আমার হাতে, কৃষ্ট্যালের হাত থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম। বললাম, 'এই নিন।'

ধূর্জটি বললো, 'না না, তুমি টানবে তো টানো।'

বললাম, 'আমার দরকার নেই।'

ধূর্জটি কলকে নিয়ে গাইলো,

'যে খায়নি প্রেমের গাঁজা
সে জানে না প্রেমের মজা।'

বলে কলকে ধরে, কয়েকটি ছোট ছোট টান দিয়ে, হঠাৎ জোরে দম নিল। মনে হল, তার বুকের খাঁচাটা ভরে ধোঁয়া নিচ্ছে। এবারে কলকের মুখে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। যোগীন্দরের আনন্দের আর সীমা নেই। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠলো, 'জয় গুরু।'

ধূর্জটিও রুদ্ধস্বরে বললো, 'জয় গুরু।'

তারপরে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়লো। কৃষ্ট্যাল আবার কলকে হাতে নিল। বললো, 'ধূর্জটি মহান।'

আমি কৃষ্ট্যালকে বললাম, 'আপনি আর চেষ্টা করবেন না।'

কৃষ্ট্যাল ছোট মেয়েটির মতো আবদার করে বললো, 'একটুখানি।'

বলে সে এবার ছোট ছোট কয়েকটি টান দিল। ধোঁয়া আটকে রাখলো। তারপরে কলকেটা যোগীন্দরের দিকে বাড়িয়ে দিল। যোগীন্দর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাবুজী?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না। কারোরই আর দরকার নেই।'

যোগীন্দর চলে গেল। ধূর্জটি চোখ বুজে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। কৃষ্ট্যাল আমার হাঁটুর ওপর হাত রেখে, চোখ বুজে ঝিম্ মেরে ঝুঁকে আছে। মনে হল, আমি যেন এক বিচিত্র ভৈরবীচক্রে বসে আছি।

ধূর্জটির গোঙানো গলা শোনা গেল, 'ভিখিরি ভিখিরি, পেলাম না।'

বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চুপ করলো। তারপরে অবিশ্বাস্যভাবে, যেন আর এক কণ্ঠস্বরে সে টপ্পার সুরে গান ধরলো.

'ভালবেসে ভালো কাঁদালে।
যদি মজিবে না মনে ছিল
কেন মজালে?'

জানি না, এটা কার টপ্পা। আমার সাধারণ জ্ঞান থেকে মনে হচ্ছে, সুরটা ভৈরবী। কিন্তু ধূর্জটির গলায় যে এমন অপূর্ব কাজ আছে, তা কখনো অনুমান করতে পারি নি। প্রত্যেকটি গলার কাজ সূক্ষ্ম, কাটা কাটা। গিটকিরিগুলো এমন অনায়াসে দিচ্ছে, যেন সে একটা পাকা গায়ক।

কেননা, পাকা গায়কের মতোই সে গাইছে, এবং একটা আর্তি তার গানের মধ্যে ফুটছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি মনে করিয়ে দেয়, 'কাঁদালে তুমি মোরে, ভালবাসারি ঘায়ে।' কিন্তু এ গানের ভাষা, তুলনায় অন্যরকম, হয়তো একটু গ্রাম্য বা পুরনো দিনের, কথাগুলো যেন মনে গেঁথে যায়। সে পরের অংশ আরো আর্ত ব্যথার সুরে গেয়ে উঠলো,

'ওগো তুমি যে পরের সোনা
আগে তা ছিল না জানা
জানলে পরে, পরের সোনা
পরিতেম না কর্ণমূলে।'

বলে উঠতে ইচ্ছা করলো, 'বাহ্, বাহবা ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র, তোমার তুলনা তুমিই হে।' কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারলাম না। রবীন্দ্র-যুগে, এ গানের ভাষা যেন আমার মর্মমূলে বিঁধে গেল। দেখলাম, ধূর্জটির মুদ্রিত চোখের কোণে, জল চিকচিক করছে। মনে পড়ে গেল তার কথা, 'আমি একটা ভিক্ষুক, কিন্তু এক কণা ভিক্ষান্ন জুটলো না।'

ক্রুষ্ট্যাল এবার একেবারে আমার গায়ের কাছে। মুখের কাছে মুখ এনে বললো, 'ওকি গাইছে, আমাকে বলে দাও।'

ইংরেজীতে এই গানের অনুবাদ করে বোঝাই, সে যোগ্যতা আমার একেবারেই নেই। তবু যতোটা পারলাম, ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ক্রুষ্ট্যাল ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'বুঝেছি ও প্রেম-তৃষ্ণার্ত। বোধহয় আমরা সকলেই তা-ই।'

ইতিমধ্যে ধূর্জটি টপ্পা শেষ করে, আবার আপন মনেই, অতুলপ্রসাদের সেই বিখ্যাত ভৈরবী ধরেছে,

'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ্
কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রেমের ফাঁদ।'

আবার বলতে ইচ্ছা করলো, 'বাহ্, বাহাবা বাহাবা।' আমার বুকটা যে কেবল ভরে উঠছে, তা না। আজ বুঝি ধূর্জটি আমাকেও কাঁদিয়ে ছাড়বে। এবার তার চোখের কোণ দিয়ে স্পষ্টতঃই জল গড়িয়ে পড়লো, যখন সে উচ্চস্বরে গেয়ে উঠলো,

কতই পেলি ভালবাসা
তবু না তোর মেটে আশা......

আমি চোখ বুজে রইলাম। ক্রুষ্ট্যাল কিছু জিজ্ঞেস করছে না। ও আমার হাঁটুর ওপরে রাখা হাতের ওপরে মুখ চেপে আছে। হয়তো, ধূর্জটির কণ্ঠস্বর, গান, গায়কি, আপনা থেকেই ওকে একটা অর্থ বলে দিচ্ছে। কে জানতো, মাতাল নারী আসক্ত ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে এমন গান ছিল, সেই

গানে এত আর্তি ছিল। অথচ কতো বিপরীত দুটি গানের ভাষা। প্রথম গাইল, ভালবাসা না পাওয়া, তারপরে পেয়েও না মেটার গান। কিন্তু আর্তি যেন দুটি গানেরই এক।

ধূর্জটি গান শেষ করে, মিনিটখানেক চুপ করে বসে রইলো। তারপরে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললো, 'ওহ্, আজ বড্ড মাতলামি করছি হে সাহিত্যিক। মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়।'

বলে কৃষ্ট্যালকে টেনে তুলে বললো, 'এসো কৃষ্ট্যাল, একটু অন্যরকম মাতামাতি করা যাক।'

কৃষ্ট্যালের মুখ ঢেকে গিয়েছে ওর সোনালি কেশে। বললো, 'না ধূর্জটি, তুমি আমার সব উত্তাপ নিভিয়ে দিয়েছ।'

বলে ধূর্জটির বুকে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ধূর্জটি বললো, 'দেখ, জার্মান মেয়ের পাগলামি দেখ। কাঁদছ কেন। চলো এবার ওঠা যাক।'

আমি ধূর্জটির পায়ে হাত ছুঁইয়ে বললাম, ধূর্জটিদা, এ রাত্রির কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

ধূর্জটি গর্জন করে বললো, 'ওরে ব্যাটা ঘুঘু, তুমি আমাকে ল্যাং মারছো?'

বললাম, 'বিশ্বাস করুন।'

'আরে, দূর তোর বিশ্বাসের নিকুচি করেছে। কাল রাত পোহালে আমার বিশ হাজার টন মাল খালাস করতে হবে। চল্ চল্, আর দেরি না, অনেক রাত হয়েছে।'

বলে কৃষ্ট্যালকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কৃষ্ট্যাল, চলো এবার যাওয়া যাক।'

কৃষ্ট্যাল তার মুখটা, ধূর্জটির বুকেই ঘষে নিয়ে, দু-হাতে চুল ঠিক করলো। অস্ফুট স্বরে বললো, 'চলো।'

ধূর্জটি যোগীন্দরকে ডেকে, পার্স থেকে এক গোছা নোট তুলে দিয়ে বললো, 'তোমার হিসাব মিটিয়ে নিও।'

যোগীন্দর টাকা গুনে দেখলো না, কারণ গোনবার দরকার ছিল না, প্রাপ্যের থেকে এতে বেশি ছিল। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'আপনার কাছে আবার হিসাব কি বাবুজী, আপনি আমার এখানে পায়ের ধুলো দিলেই আমার বরাত ভালো হবে।'

ধূর্জটি খাটিয়া থেকে নামতে নামতে বললো, 'গাঁজাটা বেশ ভালো বানিয়েছিলে। মদটাও খাঁটি ছিল।'

কৃষ্ট্যাল উঠে ধূর্জটিকে জড়িয়ে ধরলো। সে যে ভীষণ টলছে, তা বোঝা যাচ্ছে। আমি ওর হাতে, ওর ব্যাগটা ধরিয়ে দিলাম। এখন মনে

একটিমাত্র সংশয়, ধূর্জটি এ অবস্থায় গাড়ি চালাতে পারবে কী না। অবিশ্যি মদ্যপান করতে করতে তাকে আমি প্রথম দিনই গাড়ি চালাতে দেখেছি। কিন্তু সেদিন তার মস্তিষ্কে গঞ্জিকার ধূম্রজাল ছিল না। অন্ধকার গলি দিয়ে বেরোতে বেরোতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার গাড়ি চালাতে অসুবিধা হবে না তো?'

ধূর্জটি দীর্ঘ ঋজু শরীরে, কৃষ্ট্যালকে গায়ের কাছে নিয়ে, সোজা হয়ে চলতে চলতেই বললো, 'আজ অবধি তো হয়নি। নিমতলা থেকে যখন ফিরে আসতে পেরেছি গাড়ি চালিয়ে, তখন এখান থেকেও পারবো।'

ধূর্জটির কথা হয়তো দ্ব্যর্থবোধক। নিমতলা শ্মশান। সেখান থেকেও সে ফিরে আসতে পেরেছে। নিশ্চয়ই গাঁজা টেনে মৃত্যুর পরে না। তবু মৃত্যু হয়তো কখনো কখনো তাকে তাড়া করেছে, ধরতে পারে নি।

ধূর্জটি নিজেই আবার বললো, 'আমি জাতে মাতাল, তালে ঠিক আছি। ষোল-সতর বছর বয়স থেকে গাড়ি চালাচ্ছি, আজ পর্যন্ত কোনো এ্যাকসিডেণ্টের রেকর্ড নেই। কথাটা কিন্তু খুব ভালো না। একটু-আধটু এ্যাকসিডেণ্ট করা ভালো, তাতে চালক সচেতন থাকে। আমি যেদিন এ্যাকসিডেণ্ট করবো, সেদিন বোধহয় আমারো শেষ দিন।'

শুনতে ভয় লাগে। ধূর্জটি ভালোভাবেই গাড়ির দরজা খুললো। আমরা আগের মতোই বসলাম। ধূর্জটি গাড়ি স্টার্ট করলো। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে এসেছে। গাড়িও কম। ধূর্জটি আগে অমাকে আমার বাড়িতে নামিয়ে দিল।

কৃষ্ট্যাল আমার হাত চেপে ধরে বললো, 'আজ কিন্তু আমাদের একসঙ্গে থাকার কথা ছিল।'

হেসে বললাম, 'পরে একদিন হবে। আজ শুভরাত্রি।'

ধূর্জটি বললো, 'চলি হে।'

সে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

তারপরেও ধূর্জটি আর কৃষ্ট্যালের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এমন কি, কয়েক দিনের জন্য, ওদের সঙ্গে গাড়িতে বাইরেও গিয়েছিলাম। প্রধানতঃ বীরভূমই ছিল আমাদের ঘুরে বেড়াবার এবং দেখবার জেলা। তারপরে এক সময়ে কৃষ্ট্যালের ভারতবর্ষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, ও স্বদেশে চলে গিয়েছে। আমার মনে হয়, ধূর্জটি তাকে ভুলে গিয়েছে।

আমি ভুলি নি। যুগ-যন্ত্রণা বলে একটা কথা আজকাল প্রায়ই শুনে থাকি। কথাটার সঠিক কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। মনে হয়, সব যুগেই তৎকালীন যুগের যন্ত্রণা মানুষের ছিল। যেমন এ যুগেও আছে। কিন্তু 'যুগ-যন্ত্রণা' শব্দটা কোনো যুগে বোধহয় এত সোচ্চার ছিল না, বা কথাটাকে নিয়ে বর্তমান সময়ের মতো হাস্যকর বিলাসিতা করা হতো না।

যাই হোক, কৃস্ট্যালকে দেখে বুঝেছি, ও একদিকে যেমন পরিপূর্ণ একটি মেয়ে, তেমনি হৃদয়ের অপূর্ণতায় শূন্যতাবোধের হাহাকার নিয়েই বোধহয় ওকে চিরদিন চলতে হবে। ও বিয়ে করেছিল, ঘর বাঁধতে পারে নি। সংসার ওকে টেনে রাখতে পারে নি। ভারত দর্শন করে, ভারতকে খুঁজে পায় নি। মনে হয়, ও পেয়েছিল একটি মানুষকে যাকে সহকর্মী বলা যায়। সে ধূর্জটিপ্রসাদ। কিন্তু সহমর্মী মানেই, তাকে নিয়ে চিরদিন থাকা যায় না। কোনো দিক থেকেই তা সম্ভব ছিল না।

ধূর্জটির মুখে আর কৃস্ট্যালের নাম শুনি না। আমিও যেচে তা বলতে চাই না। তারপরেও আজ পর্যন্ত, ধূর্জটির সঙ্গে আমি ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় গিয়েছি, বেড়িয়েছি, বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেছি। ধূর্জটির একটি বিশেষ অভ্যাস সে ট্রেনে বা প্লেনে চেপে কোথাও বেড়াতে যায় না। সব সময়েই গাড়ি নিয়ে বেরোয়, নিজেই চালক। শুধু চালক বললে ভুল হবে। সে রীতিমতো একজন মেকানিকও বটে। অনেকবারই তার প্রমাণ পেয়েছি। গাড়ি নিয়ে চলতে গেলে, এঞ্জিন নামক বস্তুটি কখনোই সব সময় সুবোধ বালকের মতো চলে না। মাঝে মাঝে সে বিগড়ে যাবেই। ধূর্জটিও বেগড়ানো যন্ত্রকে কায়দা করার কানুনসমূহ জানে। আমি তাকে গাড়ির তলায় শুয়ে তেলকালি মেখে কাজ করতে দেখেছি। ঠিক যেন একজন মোটর মেরামতি-শ্রমিক। অথচ তার জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই।

কখনো সেরকম দরকার হলে, রাস্তায় চলন্ত লরি থামিয়ে, ড্রাইভারের সাহায্য নিয়েছে। অনায়াসে এবং সানন্দে তাদের সঙ্গে পানভোজন করেছে। হাসি ঠাট্টা গান, কিছুই বাদ যায় না। সে যে এত পরিশ্রম করতে পারে, তা তার সঙ্গে বাইরে না গেলে বোঝা বা জানা যায় না। এমন কি, এই বয়সে হাতাহাতি মারামারি, য আমার কাছে প্রায় অকল্পনীয়, তাও আমি তাকে করতে দেখেছি। তার সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। একাই সে কয়েকজনের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করেছে, এবং আমার ধারণা, জগতে এখনো বোধহয় বলবানের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি এবং মোহ আছে। আরো একটা গুণ ধূর্জটির আছে। বিদেশে মারামারি করে, বিদ্বেষ বা বড় কোনো দুর্ঘটনা কখনো ঘটতে দেয় নি। লোকজনকে কথাবার্তা বলে, নিজের আয়ত্তে আনতেও সে সমান পারঙ্গম। এমন একটা ভাব, যেন তার

বন্ধু ছড়িয়ে আছে দেশে দেশে। যেখানেই যায়, সেখানেই তার কিছু বন্ধু জুটে যায়। তা সে যে কোনো কারণেই হোক।

কিন্তু এসব ঘটনা বলবার আগে, আমি তার পারিবারিক জীবনের কথা একটু বলে নিতে চাই। বিশেষ করে তার সংসার স্ত্রী ও সন্তানদের কথা।

কৃষ্ট্যালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন সাতেক পরেই ধূর্জটিপ্রসাদ লোক মারফত একটি চিঠি পাঠালো। সেই চিঠির বয়ান আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে। সে লিখেছিল, 'তিথি নক্ষত্রাদির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অদ্য পূর্ণিমা। তোমার একজন ভক্ত—না, ভুল হল, তোমার একজন ভক্তি-মতী পাঠিকা আজ সত্যনারায়ণের পূজা করবেন। আমি তাঁর গোলামের গোলাম। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে জেনে, তিনি অতীব সুখী, এবং গৌরববোধ করছেন। নেহাত মুখোমুখি পরিচয় নেই বলে, তিনি নিজে তোমাকে তাঁর সত্যনারায়ণ পূজায় নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখতে পারলেন না। আমার উপর হুকুম হয়েছে, তাঁর অনুরোধ জানিয়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ জানানো। অন্ততঃ আমার দুর্বল গর্দানের কথা ভেবে, তুমি অবিশ্যি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং মদীয় ভবনে আগমন করবে। তোমার ভক্তিমতী পাঠিকার নাম শ্রীমতী নিবেদিতা মিত্র, আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী। আশা করি, এর অধিক কিছু লেখবার প্রয়োজন নেই। সন্ধেবেলাতেই চলে এসো। আমি বাড়িতেই থাকবো। ভালবাসাসহ, ধূর্জটিদা।'

চিঠিটি পড়ার পরে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, নিবেদিতা মিত্র কে হতে পারেন। পত্রের বয়ানেই তাঁর পরিচয় আছে, যদিও খানিকটা সাবেকি ঢঙ, এবং পত্রটি পাঠ করলেই অনুমান হয়, ধূর্জটি যেন স্ত্রীপ্রেমে গদগদ। স্ত্রীর প্রতি তার গভীর আসক্তি। চিঠিটির ভাষায় প্রমাণ হয়, একটি স্নেহ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের ভাষায় চিঠিটি লেখা হয়েছে, কোথাও বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই। আমার অবাক লাগলো এই ভেবে, আমি যে ধূর্জটিপ্রসাদকে ইতিমধ্যেই চিনেছি, চিঠির বয়ানে তার কোনো পরিচয় নেই। চিঠিটি পড়লেই মনে হয়, সুখী গৃহস্বামী, স্ত্রীগত প্রাণ। সত্যি কথা বলতে কি, চিঠিটি পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো। মুখে আমরা যতো বড় বড় কথাই বলি, আর আধুনিকতার বুলি আওড়াই, গৃহলক্ষ্মী বধূর কোমল প্রাণ, স্বামী কল্যাণকামিনী সম্পর্কে আমাদের মনে একটি বিশেষ অনুভূতি আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই বোধহয় তাই, একটু রকমফের থাকতে পারে। 'দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী' বা 'আমি তাঁর গোলামের গোলাম' আপাততঃ এসব উক্তির মধ্যে যা-ই থাক, একটি স্ত্রীঅন্তঃ প্রসন্ন প্রাণেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

পত্রবাহককে জানিয়ে দিলাম, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

কিন্তু আমার মনের কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা এবং বিস্ময় ঘুচলো না। এমন যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী আছে, তার জীবনে এত হাহাকার কিসের। এক রকমের ব্যথাবিলাসী লোক আছে, যারা নিজের মনে কল্পিত দুঃখের সৃষ্টি করে, হাহাকার ছাড়া তারা থাকতে পারে না। তাদের গায়ে যেন আগুন লেগেই আছে, তারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ধূর্জটিপ্রসাদের যন্ত্রণাও হয়তো একটা বিলাপ মাত্র। কেন না, ইতিমধ্যেই তাকে আমি যতোটুকু দেখেছি বা তার কথা শুনেছি, তাতে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, অবিমিশ্র সুখ না হোক, সে একটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে আগুনে হাত দিয়ে, আর পুড়ে মরছে। আমি ধূর্জটির সেই গানের কথা ভুলি কেমন করে। গানের সঙ্গে তার সেই চোখের কোণে জল, গানের মধ্যে তার সেই আর্তি, সে সব কি দুঃখবিলাসজাত? ভাবতে দ্বিধা হয়।

অথচ স্ত্রীর বিষয়ে, সে যেভাবে চিঠিটি লিখেছে, তার সঙ্গে, যোগীন্দরের বস্তিতে চোলাই মদ পান করে, গাঁজা টেনে, আপনা থেকে গেয়ে ওঠা, সেই লোকটির সঙ্গে একেবারেই যেন মেলাতে পারি না। অবিশ্যি এমনও হতে পারে, এই সংসার ও সমাজজীবনে দশ জনের সঙ্গে চলতে হলে, যে-ছকটি বুদ্ধিমান ভদ্রলোকদের মেনে চলা উচিত, এ চিঠি তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আসল মানুষটির সন্ধান এখানে নেই।

যাই হোক, সন্ধ্যেবেলাই আমি ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়ি গেলাম।

ধূর্জটির বাড়িটি তার পৈতৃক হলেও, সে নিজে আলাদা একটি বাড়ি তৈরি করেছে। সে বাড়িও পৈতৃক বাড়ির লাগোয়া। জমির অভাব নেই। এখনো তার বাড়ির সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা রয়েছে। সেখানে এক পাশে বড় বড় পিপে, কিছু লোহা-লক্কর ডাঁই করা রয়েছে। ওসব তার ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়। দু তিনটি বড় গাছও আছে। বাগান বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছু নেই। দুটি গ্যারেজ আছে। গেট দিয়ে ঢুকে, পাশাপাশি দুটি নতুন ও পুরনো বাড়ির কোন্‌টিতে যাবো, বুঝতে পারলাম না। দুটো বাড়িতেই আলো জ্বলছে। লোকজনের সাড়াশব্দও পাওয়া যায়।

এ সময়েই বছর ষোল বয়সের একটি ছেলে, আমার দিকে এগিয়ে এল। দীর্ঘ দেহ, ফরসা ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, মুখখানি ভারি কোমল আর মিষ্টি। লখনৌয়ের বুটির কাজ করা, কলিদার পাঞ্জাবি তার গায়ে। পরনের ধুতিটি ফুল কোঁচানো। কোঁচা পকেটে গোঁজা। পায়ে কোলাপুরি স্যাণ্ডেল। আজকালকার ছেলেরা যে পোশাক নিতান্ত বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানেই পরে। ছেলেটি মিষ্টি হেসে বললো, 'আসুন, বাবা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি ধূর্জটিদার ছেলে?'

ছেলেটি বললো, 'হ্যাঁ। আমার নাম ধৃতিপ্রসাদ।'

'তুমি আমাকে চিনলে কী করে?'

ধৃতিপ্রসাদ হেসে বললো, 'আপনাকে আবার কে না চেনে।'

লজ্জিত হলেও, আনন্দ পেলাম। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী পড়ছো?'

'আমি ক্লাস টেনে পড়ছি।'

আমিও সেই রকমই অনুমান করছিলাম। ধৃতিপ্রসাদ আমাকে নতুন বাড়িতেই নিয়ে ঢুকলো। গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে, সামনেই বিরাট হল-ঘর। প্রথমেই চোখে পড়ে গৃহসজ্জা। চমৎকারভাবে সাজানো। এক পাশে পিয়ানো, তার ওপরে বেগুনি রঙের মখমলের পর্দা ঢাকা। আর এক পাশে রেডিওগ্রাম। এত বড় ঘর, স্বভাবতঃই দুদিকে দুটো শোফা সেট সাজানো, এবং সেখানে গালিচা পাতা। তার পাশেই, বড় দরজা খোলা, এবং সেটা যে ডাইনিং রুম তা বোঝা যায়। বসবার ঘরের এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সমস্ত মেঝেই মোজাইক বাঁধানো, দেওয়ালে প্লাস্টিক পেইন্ট। আমাকে দেখেই ধূর্জটিপ্রসাদ হাঁক দিল, "এসো এসো।'

সে এক দিকের শোফা সেটে বসেছে। সেখানে আরো দু'জন রয়েছে, আমার অপরিচিত। কিন্তু ইতিমধ্যেই পান শুরু হয়ে গিয়েছে। কাঁচের টেবিলের ওপরে স্কচ্ হুইস্কির বোতল, তিনটি গেলাসে পানীয় ঢালা রয়েছে।

ধূর্জটি ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই একে ঘরে নিয়ে এলি বুঝি?'

ধৃতিপ্রসাদ বললো, 'হ্যাঁ। মা ওপরের জানালা থেকে ওঁকে দেখতে পেয়ে, আমাকে বললো, তোমার কাছে পৌঁছে দিতে।'

ধূর্জটি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'তাহলেই বোঝ সাহিত্যিক, আমার বাড়িতে তোমার কী পজিশন। স্বয়ং গিন্নী তোমাকে ওপর থেকে দেখতে পেয়ে, ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বসে বসো। খোকা, নৃপতিকে একবার পাঠিয়ে দে। মা'কে বলিস পুজো সাঙ্গ হলেই যেন আমাদের ডাকে।'

'আচ্ছা।' বলে ধৃতিপ্রসাদ আমার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে, ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেল।

ধূর্জটিপ্রসাদ তার অতিথিদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। একজন ব্যবসায়ী, আর একজন সরকারি হোমরাচোমরা অফিসার। দুজনেই

ধূর্জটির থেকে বয়সে অনেক বড়। ধূতিপ্রসাদের মতো এত বড়ো ছেলে যে ধূর্জটির আছে, ভাবতে পারিনি। এবং আরো একটি কথা আমার মনে হল। নিবেদিতা মিত্র, অর্থাৎ ধূর্জটি-গৃহিণী আমাকে চিনলো কী করে। ওপরের জানালা থেকে দেখে সে-ই ছেলেকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

নৃপতি নামক লোকটি এল, একেবারে তৈরি হয়ে। মাঝবয়সী, ধুতি সার্ট পরা, দেখতে-শুনতেও মোটেই চাকরবাকরের মতো না। তার হাতে একটি গেলাস, আর ঠাণ্ডা সোডার বোতল। গেলাসটি রেখে সে ওপ্‌নার দিয়ে, সোডার বোতলের মুখ খুললো। ধূর্জটি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে উদ্যত হতেই, বললাম, 'আজ সত্যনারায়ণের দিন, এসব থাকলে হতো না?'

ধূর্জটি বললো, 'মাথা খারাপ। পুজোপাটের দিন, সিন্নি খাবো, আর মদ্যপান চলবে না? সত্যনারায়ণ অসন্তুষ্ট হবেন। তোমাকে আমি অল্পই দিচ্ছি।'

জানি, কোনো কথাই চলবে না। একটু নিয়ে বসতেই হবে। ধূর্জটি-প্রসাদ তো না, মনসা। ভাবতে অবাক লাগে, সপ্তাহখানেক আগে, দেশীয় ঢোলাই, বস্তির ঘর, মোমের আলো, শাল পাতায় চাঁপ আর গাঁজা, আর কোথায় স্কচ্ হুইস্কি, ফ্রিজের ঠাণ্ডা সোডা, আর এই রাজকীয় ঘরদোর। কোনো দিক মেলানো যায় না। গৃহকর্তাকেও না। ধূর্জটি বললো, 'এবার ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা থাক, সাহিত্যিক এসে গেছে, অন্য কথাবার্তা হোক।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, আপনারা আপনাদের কাজের কথা বলুন না।'

ধূর্জটি বললো, 'আমরা কেউ-ই কাজের কথা বলতে বসিনি। তবে ময়রারা একত্র হলেই যেমন ছানার দর নিয়ে কথা না বলে পারে না, আমাদেরও সেই রকম।'

তথাপি যেসব বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হল, তা আমার উপাদেয় লাগলো না। সরকারি অফিসের কেচ্ছা-কেলেংকারি নিয়েই কথাবার্তা হল বেশি। তার মধ্যে দু-একবার পুষ্প দত্তর কথাও উঠলো, এবং জানা গেল, পুষ্প দত্ত আজ সত্যনারায়ণ পুজোয় আসবে।

এক সময়ে ওপরে কাঁসর ঘণ্টা এবং শাঁখ বেজে উঠলো। আমাদের ওপরে ডাক পড়লো। সকলেই ধূর্জটির সঙ্গে গেলাম। সেখানে ধূর্জটির কিছু আত্মীয় মহিলারা এবং ছেলেমেয়েরা ছিল। নিবেদিতা তখন প্রণাম সেরে উঠেছে। একজন বিধবা মহিলা সবাইকে প্রসাদ পরিবেশন করছেন। বোঝা গেল, পাত পেড়ে যেভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে, ব্যবস্থা রীতিমতো ভুঁড়িভোজের। এসবই আমি পাশের ঘর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ধূর্জটি

গলা তুলে ডাকলো, 'কই, মণি কোথায় গেলে? এদিকে এসো। তোমার আজকের প্রধান অতিথি এসেছেন।'

নিবেদিতা এল। চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ি, আর গরদেরই স্লিভ-লেস্ ব্লাউজ নিবেদিতার পরনে। শাড়িটি আটপৌরে ধরনে পরা না, কুচিয়ে ফেত্তা দিয়ে, আধুনিক কেতায় পরা। ব্লাউজটিও কাঁচুলিসদৃশ, পেট পিঠের অনেকখানি দেখা যায়। তা যাক, কিন্তু নিবেদিতাকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। হাতে দুটি জড়োয়ার বাউটি, গলার অলংকারটিও জড়োয়ার, এবং কানেরও। সে বেশ বড় করে খোঁপা বেঁধেছে। ভুরু এঁকেছে, কপালের মাঝখানে বেশ বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা পরেছে। ঠোঁটেও রক্তিম প্রলেপ। বড় খোঁপাটির ওপর অল্প করে ঘোমটা টানা। এখন বুঝতে পারছি, ধূর্জটির ছেলে কার মুখের আদল পেয়েছে। নিবেদিতার ফরসা মুখটিও কোমল এবং মিষ্টি, লক্ষ্মীঠাকরুণ ভাব। সিঁথি আর কপালের সিঁদুর এবং পায়ে আলতা, সবই বেশ সুন্দর মানিয়েছে তাকে। মানুষটি একটু খাটো, ঝোঁকটাও মোটার দিকে। তাহলেও বেমানান কিছু না। নিবেদিতা দু-হাত জোড় করে, আমাকে নমস্কার জানালো। আমি প্রত্যুত্তর দিলাম। বাকী দুজনকেও নমস্কার করে, নিবেদিতা আমার দিকে চেয়ে বললো, 'বসুন।'

এ ঘরেও বসবার শোফা ছিল। ধূর্জটি বললো, 'পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই দেখছি তুমি নমস্কার করে বসতে বললে। চিনলে কী করে?'

নিবেদিতাও ছেলের মতোই বললো, 'ওঁকে আবার কে না চেনে।'

ধূর্জটি বললো, 'দেখছো তো সাহিত্যিক, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ একেই বলে। কোনোদিন আমার বাড়ি এলে না, তবু আমার বৌ শুদ্ধ তোমাকে চিনে বসে আছে। তোমাদেরই কপাল বটে।'

নিবেদিতা স্বামীর প্রতি একটু ভ্রূকুটি হাসি নিক্ষেপ করে বললো, 'আচ্ছা হয়েছে, তোমাকে আর বক বক করতে হবে না। ওঁদের নিয়ে তুমি বসো দিকিনি।'

'যথা আজ্ঞা।'

বলে ধূর্জটি আমাদের নিয়ে শোফায় বসলো। এ সময়েই এল পুষ্প দত্ত। এ পুষ্প দত্ত সেই প্রথম ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে দেখা মাতাল পুষ্প দত্ত না। গরদের লালপাড় শাড়ি না পরলে, তাকেও নিবেদিতাই বলা যেতো। সাজ-গোজ করা ধনী গৃহিণী যেমন হয়, পুষ্প দত্তকে সেই রকমই প্রায় দেখাচ্ছে। কস্‌মেটিকের ব্যবহার একটু উগ্র। কিন্তু কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে। মনে মনে ভাবলাম, গজানন দত্তর পরমায়ু তবু বাড়বে না?

নিবেদিতা হাত তুলে নমস্কার করে বললো, 'আসুন মিসেস দত্ত।

এতো দেরি কেন?'

পুষ্প একটু করুণ মুখ করে বললো, 'জানেনই তো আমার অবস্থা। বেরোতে হলে, ওঁর সব ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে, খাবার-দাবার ঠিক করে দিয়ে আমাকে আসতে হয়।'

নিবেদিতার মুখেও একটু করুণ অভিব্যক্তি ফুটলো। বললো, 'হ্যাঁ, সে তো সত্যি কথা। কেমন আছেন উনি এখন?'

পুষ্প অসহায় করুণ মুখে বললো, 'পরিবর্তন কিছু নেই, সেই একই রকম। ডাক্তাররা এখন সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু উনি যেতে চাইছেন না।'

ধূর্জটি বলে উঠলো, 'দরকার কী। আমি তো বলি, যে দেশে মোর জন্ম সে দেশেতেই মরি।'

নিবেদিতা স্বামীর প্রতি কোপ-কটাক্ষ হেনে বললো, 'বাজে বাজে অলক্ষুণে কথা বলো না তো।'

ধূর্জটি পুষ্পর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা তুমিই বলো, আমি অলুক্ষণে কথা কী বলেছি? মিঃ দত্ত যখন তাঁর দেশের মাটি ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তখন জোর করার কী দরকার।'

নিবেদিতা বললো, 'তা বলে চিকিৎসা করতে হলে, বাইরে যেতে হবে না?'

ধূর্জটি নিরীহভাবে বললো, 'সে কথা অবিশ্যি ঠিক।'

এ সময়ে কুড়ি-একুশ বছরের একটি তন্বী ঘরে ঢুকে, নিবেদিতাকে বললো, 'ছোট মামী, তুমি একবার এদিকে এসো।'

নিবেদিতা বললো, 'এই যে যাচ্ছি।'

আমাদের দিকে ফিরে হেসে বললো, 'বসুন আপনারা। মিসেস দত্ত, না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবেন না।'

পুষ্প বললো, 'নিশ্চয়ই, তবে আপনার ইচ্ছামতো না, আমার সাধ্যমতো খাবো।'

নিবেদিতা হেসে পাশের ঘরে চলে গেল। আমরা সবাই তখন বসেছি। পুষ্পকে এই আমি দ্বিতীয় বার দেখছি। অন্য দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে, পুষ্পর আগেই আলাপ আছে, কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল। এবং ভালো রকম মেলামেশাও আছে মনে হয়। ধূর্জটি আমাকে দেখিয়ে বললো, 'এর সঙ্গে বোধহয় তোমার পরিচয় নেই।'

পুষ্প দত্ত আমার দিকে ফিরে তাকালো। তার চোখে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের কৌতূহল। বললো, 'না, কখনো পরিচয় হয়েছে বলে তো মনে করতে পারছি না?'

সেই রাত্রের কথা আমার মনে পড়লো। মোমের অস্পষ্ট আলোয়, রক্তিম ঢুলু ঢুলু চোখে, সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। মনে করে রাখবার মতো, মস্তিষ্কের অবস্থা তার সুস্থ ছিল না। ধূর্জটির সঙ্গে আমার একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। কিন্তু সেই রাত্রের প্রসঙ্গ না তুলে, সে পুষ্প দত্তর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

পুষ্প দত্ত হঠাৎ যেন খুব খুশি হয়ে উঠলো, বললো, 'আরে কী আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ করার ইচ্ছা ছিল। মিঃ মিত্রের কল্যাণে তা হয়ে গেল।'

ধূর্জটি বললো, 'মিস্টার না, মিসেস মিত্রের কল্যাণে বলো। ও আজ মিসেস মিত্রর অতিথি হিসাবে আমার বাড়িতে এসেছে।'

পুষ্প বললো, 'আপনার সঙ্গে যে ও'র পরিচয় আছে, কোনোদিন তা বলেননি তো?'

ধূর্জটি বললো, 'সেরকম প্রয়োজন বা অবকাশ কখনো আসেনি বলেই।'

পুষ্প দত্ত আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত।'

ধূর্জটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি টানাটানি করো না।'

পুষ্প ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি বুঝি সবাইকে নিয়ে টানাটানি করি?'

ধূর্জটি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললো, 'না, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি তোমার প্রীতি আবার একটু বেশি কী না, সেজন্যই বললাম।'

বলে সে অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে চোখাচোখি করে হাসলো। তাঁরাও হাসলেন নিঃশব্দে। কিন্তু পুষ্প সে সব মোটেই গায়ে মাখলো না। বললো, 'আপনার সঙ্গে একটু মিশতে আর কথাবার্তা বলতে পেলে খুশি হব। মিঃ মিত্রের সঙ্গে একদিন আসবেন।'

ধূর্জটি বললো, 'আবার আমার সঙ্গে কেন। তোমার ঠিকানা টেলিফোন ওকে জানিয়ে দাও, ওর ঠিকানা নাও, দুজনে যোগাযোগ করে নিও।'

পুষ্প দত্ত সঙ্গে সঙ্গে তাই করলো। সে তার ব্যাগ খুলে, একটি ছোট কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিল। একটি ছোট নোট বুক আর কলম বের করে বললো, 'আপনার ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বারটা বলুন।'

রীতিমতো শঙ্কা বোধ করছি। এখন যে পুষ্প দত্তর সঙ্গে কথা বলছি, তাকে নিয়ে আমার কিছুমাত্র ভাবনা নেই। সে এখন ধূর্জটিকে 'আপনি'

সম্বোধন করছে। ভদ্র, অমায়িক, স্বামীর অসুস্থতায় চিন্তিত, বিষণ্ন। কিন্তু সে তো জানে না, তার আর একটি রূপ আমার নিজের চোখেই দেখা আছে। শোনা হয়েছে, তার থেকেও বেশি। এ গরীব সাহিত্যিকের ঠিকানা নিয়ে, মহা মহিমময়ী পুষ্প দত্তর কী লাভ। আমি একবার ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে আমার বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর দিলাম। পুষ্প দত্তর কার্ডখানা পকেটে রাখলাম।

তারপরে যতোটা সম্ভব, সম্ভ্রম এবং সম্মান বাঁচিয়ে, পুষ্প আর ধূর্জটির মধ্যে খানিকটা মান-অভিমানের পালা চললো। তা থেকে বোঝা গেল, সেই ঝড়-বৃষ্টির রাত্রের পরে, ধূর্জটি আর পুষ্পকে দেখা দেয়নি। ধূর্জটি নানান কাজের অছিলা করলো। এক সময়ে, মনে মনে আমারই খুবই হাসি পেল, যখন পুষ্প ধূর্জটিকে বললো, 'অন্ততঃ আমার অসুস্থ স্বামীকে দেখবার জন্যও এক-আধদিন যেতে পারেন।'

জবাবে ধূর্জটি গম্ভীর মুখে বললো, 'যাবো যাবো। বুঝতেই তো পারছো, নানা কাজের ঝামেলা নিয়ে থাকতে হয়।'

তাদের এসব কথার সময়েই নিবেদিতা এল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী কথা হচ্ছে?'

পুষ্প বললো, 'এই দেখুন না মিসেস মিত্র, আপনার কর্তাকে বলছিলাম, আপনাকে নিয়ে, তিনি তো এক-আধ দিন আমার স্বামীকে দেখতে যেতে পারেন।'

নিবেদিতা অনায়াসে বললো, 'মিঃ মিত্রর সঙ্গে যাবার সৌভাগ্য আমার কোনোদিনই হবে না। মিঃ দত্তকে দেখতে আমি নিজেই যাবো একদিন।'

ধূর্জটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'তাহলেই বুঝতে পারছো, এতো কাজ-কর্ম নিয়ে থাকি, আমার ওপর কারোর ভরসা করা চলে না।'

নিবেদিতা ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো, 'তুমি কাজকর্ম নিয়ে থাকো বলে, তোমার ওপর ভরসা করি না, তা না। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু বলে একটা কথা আছে তো। দুটো আলাদা জগৎ।'

বলে নিবেদিতা পুষ্পর দিকে তাকিয়ে হাসলো। ধূর্জটি একটু ম্লান হেসে বললো, 'মিথ্যা বলোনি।'

নিবেদিতা সবাইকে ডেকে বললো, 'আপনারা আসুন, একটু প্রসাদ খাবেন।'

নিবেদিতার সঙ্গে আমরা পাশের ঘরে গেলাম। এখন আর সেখানে কোনো গোলমাল নেই, অন্য লোকজনও নেই। এবং এখানে ডাইনিং রুমের টেবিল চেয়ারের কোনো ব্যাপার নেই। মোজাইকের পরিচ্ছন্ন মেঝের ওপরে সুদৃশ্য মখমলের আসন পাতা রয়েছে আমাদের জন্য। আমরা সকলেই

বসলাম। প্রসাদ পরিবেশিত হল কলা পাতায়। প্রথমেই সিন্নি এবং ফলমূল। তারপরে একে একে এল ডালপুরি, আলুর দম, ছানার ডালনা, খাস্তা গজা, সন্দেশ, পায়েস এবং দৈ। আমি না বলে পারলাম না, 'এটা ঠিক সত্যনারায়ণের প্রসাদ খাওয়া হল না, একেবারে যজ্ঞিবাড়ির ভোজ।'

নিবেদিতা আমাদের নিজের হাতে পরিবেশন করছিল। হেসে বললো, 'এ আবার যজ্ঞিবাড়ির ভোজ নাকি?'

পুষ্প বললো, 'মিসেস মিত্র যখন যজ্ঞিবাড়ির ভোজ দেবেন, সেটা তাহলে কী রকম হবে, বোঝা যাচ্ছে।'

নিবেদিতা বললো, 'সেটা হবে আমার ছেলের বিয়ের সময়। মেয়ে তো এখনো বড়ই ছোট। আমার ছেলের বিয়ে আগেই হবে।'

নিবেদিতার কথাবার্তার মধ্যে, তার নিজের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে কখনো, 'আমাদের ছেলে' বললো না, 'আমার ছেলে' বললো। ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় বা কী হবে না হবে, এসব যেন তার একলার ব্যাপার। তার মধ্যে ধূর্জটি কোথাও নেই। সে আমাদের যেভাবে খাওয়ালো, ধূর্জটিকেও সেভাবেই, 'এটা নাও, ওটা খাও', করে খাওয়ালো। ধূর্জটি আপত্তি করলেও, সে শুনলো না। কিন্তু ধূর্জটির পাতে খাবারের ডাঁই জমে রইলো। যতোটুকু খাবার, ততোটুকুই খেল। বললো, 'নষ্ট করো না।'

নিবেদিতা বললো, 'তোমার পাতের খাবার নষ্ট হয় না এ বাড়িতে। খাবার অনেক লোক আছে।'

বলে একটু হেসে বললো, 'তুমি ভালোই জানো, আমি নষ্ট করা একেবারে পছন্দ করি না। সেইজন্যই তো তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া।'

বলে সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ধূর্জটি বললো, 'নিবেদিতা মিত্রের ঘরে নষ্ট? এমন অপবাদ ভগবান এসে দিলেও কেউ মানবে না।'

নিবেদিতা একটু লজ্জা পেয়ে হেসে, ভ্রূকুটি করে বললো, 'আর থাক্, তোমাকে বাজে কথা বলতে হবে না।'

পুষ্প বললো, 'তা যাই বলুন মিসেস মিত্র, পরিচিত মহলে সকলের মুখে, আপনার গৃহিণীপনার যা সুখ্যাতি শুনি, আমার তো হিংসেই হয়।'

নিবেদিতা আরো লজ্জা পেয়ে বললো, 'কী যে বলেন।'

ধূর্জটির বন্ধু, সরকারি অফিসারটি বললেন, 'আমিও শুনেছি, মিসেস মিত্র না থাকলে, ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্রর হাল বেহাল হয়ে যেতো।'

নিবেদিতার মুখে স্পষ্টতঃই খুশি আর লজ্জার অভিব্যক্তি। বললো, 'কেন বলছেন। আসল লোক তো মনে মনে হাসছেন।'

ধূর্জটি বললো, 'কে, আমি? এত বড় মহাপাপ আমি করবো না, যে

সত্যি কথা শুনে মনে মনে হাসবো।'

বলে সেই অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিজের স্ত্রী বলে, আপনারা ভাববেন, আমি ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছি। এ সংসারের দায়িত্ব তো বটেই, এমন কি আমার ব্যবসাসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে নিবেদিতার সাহায্য না পেলে আমার চলে না।'

নিবেদিতা ভ্রূকুটি, কিন্তু খুশির কটাক্ষ হেনে বললো, 'আহ্, চুপ করো তো তুমি।'

আমি ধূর্জটির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, সে মোটেই মিথ্যা বলছে না, বা ঠাট্টার ভান করছে না। তার মুখে রীতিমতো কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি। এই ধূর্জটির সঙ্গে, আমার দেখা আর এক ধূর্জটির সঙ্গে যেন কিছুতেই মেলাতে পারছি না। নিজের মুখে যে স্ত্রীর এইরকম পরিচয় দেয়, সে কিসের আগুন বুকে নিয়ে ছুটছে? তার কিসের হাহাকার? আমি তো মনে করি, এমন স্ত্রী ভাগ্যবান স্বামীর ভাগ্যেই জোটে।

ধূর্জটি আবার বললো, 'চুপ তো করবোই না, বরং সে কথাটা না বলে পারছি না। এই মাসখানেক আগের কথা বলছি, একটা সামান্য ভুলের জন্য যে লাখ দেড়েক টাকার ক্ষতিই হয়ে যেতো, তা না। হয়তো দুর্নীতির দায়ে আমার শ্রীঘর বাস করতে হতো। অন্ততঃ একটা মামলা তো হতোই, কলঙ্কের বোঝা আমার মাথায় চাপতো। আর সমস্ত ব্যাপারটাই হতো কেন্দ্রীয় সরকারের হাত দিয়ে, যাকে বলে, সি. বি. আই.-এর ইনভেস্টিগেশান।'

শুধু আমি না, সকলেই নিবেদিতার দিকে সপ্রশংস বিস্ময়ে তাকালো। নিবেদিতার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

'ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। আমার নেহাত ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেছল, তা-ই।'

ধূর্জটি বললো, 'একটা মিলিটারি অর্ডার সাপ্লাইয়ের মাল, আমি সই করে, প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিলাম এক মারোয়াড়ি প্রাইভেট ফার্মকে। সেই মারোয়াড়ি ব্যাটাও এমন শয়তান, একটি কথাও না বলে, সেই অর্ডারের হিসাবে, অর্ডার নাম্বারসহ, সমস্ত টাকাটা আমার কোম্পানীর নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিয়েছিল। বোঝ, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো। ঘুষ আমাদের অনেককেই দিতে হয়, অনেক কর্তাব্যক্তিদের। কিন্তু মিলিটারির মাল নিয়ে আমি চোরাই কারবার করছি, এটা জানাজানি হলে কী কাণ্ড ঘটতে পারতো। নিবেদিতা কাগজপত্র দেখে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে টেলিফোন করেছে, সাপ্লাই ক্যান্সেল করেছে, নিজে ফোর্ট উইলিয়মের অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সমস্ত ব্যাপারটা বলেছে। আমি তখন তিন-চার

দিনের জন্য রাউরকেলায় গেছলাম। নিবেদিতা বলছে বটে, ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। ঠিক কথা। কিন্তু অনেক ভুলের মাশুল দিতে, মানুষকে গলায় দড়ি পর্যন্ত দিতে হয়।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় নিবেদিতা মিত্রকে দেখলাম। পুষ্প দত্তর চোখে-মুখেও প্রশংসা। কিন্তু তার চোখের গভীরে কোথায় যেন একটি বিষণ্ণতাও আছে। আর আমি বারে বারেই, ধূর্জটির কথা ভাবতে লাগলাম। এমন রূপসী, বুদ্ধিমতী, কর্তব্যপরায়ণা, এবং রসিকাও নিঃসন্দেহে, এমন স্ত্রী কোন্ পুরুষের না কাম্য। আর যে পুরুষ এমন স্ত্রী লাভ করবে, সংসারে তার মতো সুখী-ই বা কে হবে।

ভুরিভোজের পরে, পান চিবিয়ে বিদায় নিলাম। নিবেদিতাকে কথা দিলাম, মাঝে মাঝে তার গৃহে আসবো, এবং প্রতি মাসে পূর্ণিমার তিথিতে, তার সত্যনারায়ণ পুজার, যাকে বলে পার্মানেণ্টলি অতিথি হবো, এই স্বীকৃতিও দিলাম।

নিচে নেমে ধূর্জটি চাইলো, পানের আসরে আবার আমি বসবো। আমি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন সে বললো, 'চলো, তাহলে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পুষ্প দত্ত তার নিজের গাড়িতেই এসেছিল। সে বললো, 'সাহিত্যিককে আমিও পৌঁছে দিতে পারি।'

ধূর্জটি বললো, 'এরকম চোখের সামনে, ডাইনির হাতে ছেলে সমর্পণ করি কী করে।'

নিচে এসে, পুষ্পর মুখ খুলেছে। বাকী দুজন অতিথিও বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। পুষ্প বললো, 'না, ডাইনির হাতে ছেলে সমর্পণ করতে হবে না। ডাইনি আজ প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছে, সে ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্রের ঘাড়ে চাপবে।'

ধূর্জটি কপট ভয়ে বললো, 'ওরে বাবা, আমি পারবো না। তাহলে তুমি সাহিত্যিককে নিয়েই যাও।'

'যাবো, ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেব। কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না। তুমি এখন ঘরে বসে বসে একলা হুইস্কি গিলবে, সেটি হতে দিচ্ছি না। তোমার বাড়িতে বসে আমি ড্রিংক করতে পারবো না। হোটেলে যাবো। চলো, দেরি করো না।'

ধূর্জটি যেন খুবই অসহায় হয়ে পড়লো। এবং অসহায়ভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'নারী ড্রাকুলার পাল্লায় পড়েছি, আজ রেহাই নেই।' পুষ্পর দিকে ফিরে বললো, 'তাহলে এক কাজ করো। তুমি তোমার

ড্রাইভারকে নিয়ে হোটেলে চলে যাও। হোটেলের লজের কোণের দিকে বসো, ভেতরে যেও না। আমি বেরোচ্ছি।'

পুষ্প চোখ পাকিয়ে বললো, 'দেখো, এদিক ওদিক হয় না যেন।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'গুড নাইট, পরে আবার দেখা হবে।'

পুষ্প দত্ত চলে গেল। একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ধূর্জটিপ্রসাদ হল সেই জাতের পুরুষ, মেয়েরা সাধারণতঃ যাদের দেখলেই, তাদের সান্নিধ্যে আসতে চায়। কেবল যে সান্নিধ্যেই আসতে চায় তা না। তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সুখী হতে চায়। এই সমর্পণ ভালবাসা কী না, আমি জানি না। মনে হয়, ভালবাসা না। এক একজন পুরুষ আছে, রমণীরা তাদের ভোগ করতে চায়। যেমন, এমন রমণীও আছে, পুরুষমাত্রেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই রমণীকে যে বিশেষভাবে সুন্দরী হতেই হবে, তা নাও হতে পারে। এটাকে এক রকমের মানসিক বিকার বলা চলে কী না জানি না।

অবিশ্যি একথাও ঠিক, ধূর্জটি নিজেও নারীসঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না। সে নিজেই আমাকে বলেছে, 'আমি হলাম তামসিক। চির তমসার রাজ্যে আমার বিচরণ। মৃত্যু আমাকে সেই চির তমসার রাজ্যেই টেনে নিয়ে যাবে।' সে যেখানেই গিয়েছে, হয় নারী স্বেচ্ছায় তার কাছে এসেছে। অথবা সে নিজেই নারী সংগ্রহ করেছে।

যাই হোক, এসব কথায় পরে আসছি। আজকের রাত্রে, ধূর্জটি আমাকে রেহাই দিল না। সে আমাকেও হোটেলে টেনে নিয়ে গেল। হোটেলে আধো অন্ধকার, সবুজ ঘাসের লনটি বেশ সুন্দর। সঙ্গিনীকে নিয়ে, এক কোণে বসে, পান করার পক্ষে, যাকে বলে একেবারে আইডিয়েল জায়গা। নতুন কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বিশেষ হল না। একমাত্র পুষ্প দত্ত মাতাল হয়ে, ধূর্জটির সামনেই আমার মুখ টেনে চুম্বন করলো, যা আমাকে কোনো কারণেই খুশি করলো না। কারণ পুষ্প দত্তর এটা একটা স্বভাব মাত্র। পুষ্প তার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। তার মাতলামি যতো বাড়তে লাগলো, দৈহিক আকাঙ্ক্ষার আচরণসমূহ তীব্রতর হতে লাগলো।

ধূর্জটির কাছে যেন ব্যাপারটা কিছুই না। সে বেয়ারাকে ডেকে বিলের টাকা মেটালো। পুষ্পকে হাত ধরে তুললো। পুষ্প তাকে জড়িয়ে ধরলো। সেই অবস্থায় তাকে গাড়িতে তোলা হল। ধূর্জটি আমাকেও গাড়িতে উঠতে বললো। আমি বললাম, 'আপনারা যান, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

ধূর্জটি বললো, 'তোমাকে আমি এখুনি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। আমার

তো এখন সবে কলির সন্ধ্যে। ওকে কখন নামাতে পারি দেখি। বুঝতেই পারছো, লজ্জা করেও কোনো লাভ নেই। এখনো অনেক কিছুই বাকী, তারপরেও আঁচড়ানো কামড়ানো কান্নাকাটি থাকবে। সেগুলো আর তোমার সামনে ঘটাতে চাই না।'

সেটাও আমার ভাগ্য। তিনজনেই গাড়ির সামনে বসলাম। পুষ্প আমার কোলের ওপর একটা হাত রাখলো। আর একটা হাত ধূর্জটির কাঁধে। তার বসার ভঙ্গিটা এতোই অশালীন—অশালীন না বলে বোধহয় অন্য কিছু বলা উচিত। স্বভাবতঃই তার বুকের আঁচল খসা।

ধূর্জটি আমাকে আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। পুষ্প আবার চুম্বন দিয়ে বিদায় জানালো। আমি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে, আকাশের দিকে তাকালাম। নিরিবিলি রাত্রের রাস্তা। আকাশে চাঁদ। পূর্ণিমা, সত্যনারায়ণ পুজো, আর নিবেদিতার মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। জানি না, সে এখন কী করছে। ধূর্জটি কী করছে, তা কিছুটা অনুমান করতে পারি। আমার বুক ঠেলে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি একটি খণ্ড রচনায় শেষ করতে পারবো, তা কখনো সম্ভব না। তার জীবনে বহু ঘটনা, ইতিহাস বলা যায়। তাকে আমি কাজের মধ্যে দেখেছি, অকাজের মধ্যেও দেখেছি। কাজে-কর্মে আমি কখনো তাব ফাঁকি দেখি নি। সত্যি বলতে কি, লোকটি কাজ ভালবাসে। সংসারের কর্তব্যে কোনো অবহেলা দেখতে পাই নি। তার মধ্যে আমি বীররস দেখেছি। দয়ামায়াও দেখেছি। পাড়ায় এমনিতেই তার বেশ কিছু পোষ্য যুবক আছে, যারা তার চাকরি করে না, কিন্তু নানান কাজে লাগে। এ ছাড়াও আমি তাকে দান-ধ্যান করতেও দেখেছি। মনের দিক থেকে সে মোটেই ক্রূর বা কঠিন না। যদিও তাকে দেখলে সেরকম মনে হতে পারে। আর কথাবার্তা বলার ধরণটাও একটু রুক্ষ প্রকৃতির।

বেশ কিছু বছরের মধ্যে, একবার মনে আছে, সে আমাকে উড়িষ্যার এক জায়গায় নিজের গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে সে কাজেই গিয়েছিল। কাজ মেটাবার পরে, পাহাড়ের কোলে, জঙ্গল ঘেঁষে, একটি বাংলোয় আমরা উঠেছিলাম। সুরা তো তার সঙ্গেই থাকতো। দুটি স্বাস্থ্যবতী রূপসী সাকী জুটতেও কোনো অসুবিধা হয় নি।

আমি তাকে দু-একবার ঠাট্টা করে বলেছি, 'ধূর্জটিদা, আর যাই করুন, আমাকে ব্লু ফিল্মটা দেখাবেন না।'

ধূর্জটি হা হা করে হেসে বলেছিল, 'ওয়াণ্ডারফুল! চমৎকার বলেছ, ব্লু ফিল্ম! দেখেছ নাকি কখনো?'

'একবার, কিন্তু বড় গ্লানিবোধ করেছিলাম। কলকাতার সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতেই দেখেছিলাম।'

'এটা দেখতে আমিও বড় বিরক্তি বোধ করি। ওসব দেখবে কারা? আশী বছরের বুড়ো, যার খাঁই আছে, অথচ ক্ষমতা নেই। কিংবা নপুংসকেরা দেখবে। আমি ওসব দেখতে চাই না। আমার মন আর শরীর এখনো বেশ তাজা আছে। ভয় নেই, আমি এতোটা নির্লজ্জ এখনো হই নি, যে ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো তোমার সামনে আচরণ করবো।'

'রাগ করলেন নাকি?'

'আরে না না, তোমার মনের কথাটা বুঝেছি। এতদিন ধরে মিশছি, আর এটা বুঝি না?'

মনে আছে, উড়িষ্যার সেই বাংলোতে, রাত্রে যে কোনো কারণেই হোক, ধূর্জটির যেন নারীদের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। একটু উদাসভাবে বসেই, বাংলোর বারান্দায়, সে মদ্যপান করছিল। আমাকেও তার সঙ্গ দিতে হচ্ছিল। আমি বললাম, 'ধূর্জটিদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, যদি ভরসা দেন।'

ধূর্জটি বললো, 'তোমার কাছে আমি আমার জীবনের কিছুই গোপন রাখতে চাই না।'

আমি তথাপি একটু সংকোচ করে বললাম, 'আপনার জীবনটা দেখে, আমি বৌদির সঙ্গে, আপনাকে মেলাতে পারি না।'

ধূর্জটি একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রকম? একটু খোলসা করে বলো।'

বললাম, 'বৌদিকে যা দেখেছি, তার রূপ বলুন, গুণ বলুন এমন স্ত্রী পরম ভাগ্যে জোটে। কিন্তু আপনাকে দেখলে মনে হয় না, বৌদির মতো একজন স্ত্রী আপনার আছে।'

ধূর্জটি হেসে বললো, 'আমি যে একটা হতভাগা।' বলে পানীয়ের গেলাসে চুমুক দিল।

আমি বললাম, 'এটা কিন্তু দাদা ঠিক জবাব হল না।'

ধূর্জটি হেসে বললো, 'ঠিক জবাবই দিয়েছি ভাই, বুঝতে ভুল করো না। আমি নিজেই জানি, নিবেদিতার মতো গুণবতী মেয়ে কমই আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো, তোমার মনে আছে বোধহয়, নিবেদিতার

নিজেরই কথা, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুর কথা?'

'হ্যাঁ মনে আছে।'

'সেটা ও হয়তো অন্য কথা বলেছিল। আসলে আমি হলাম আমার পরিবারের একজন আউট-সাইডার। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা, সকলের কাছেই আমি অপরিচিত, একজন বহিরাগত ছাড়া কিছু নই।'

বলতে বলতে ধূর্জটির মুখে গভীর একটা ব্যথার ছায়া নেমে এল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কিন্তু আমি তার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। সে আবার বললো, 'আমি আছি ঠিকই, কিন্তু নিবেদিতা ওর ছেলেমেয়ে নিয়ে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। ওদের এলাকার দোষ দেব না, আমরা কেউ কারোর দরজা খুলতে পারলাম না। এই মাঝ বয়স অবধি সংসার করে গেলাম। ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র একজন স্বামী, একজন পিতা, একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু মুশকিল হল এই, ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র আরো কিছু হতে চেয়েছিল, আর তা হতে হলে, যে বস্তুটি পাওয়া দরকার, অনুভব করা দরকার, তা আমার কোনোদিনই লাভ হয় নি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'সেটা?'

ধূর্জটি একটু ভাবলো, তারপরে বললো, 'রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ-এর "পুকুর ধারে" কবিতাটা পড়েছ?'

বললাম, 'পড়েছি নিশ্চয়, তবে তেমন করে মনে রাখতে পারি নি।'

ধূর্জটি বললো, 'আমিও লাইন বাই লাইন মনে করে রাখতে পারি না। কিন্তু এমন একটা ছবি দেখতে পাই, আমার বুকের মধ্যে বড় টনটন করে ওঠে। এত ব্যাকুল হয়ে উঠি, মনে হয়, চোখ ফেটে জল এসে পড়বে। মনে মনে বলি, "হে গুরুদেব, তুমি তাকে কোথায় দেখেছিলে, কোন্ পুকুরের ধারে? আমাকে একবারটি দেখতে দাও। আমার জীবনে তাকে এনে দাও।"'

আমার মনে হল, ধূর্জটি যেন স্বপ্নের মধ্যে কাতর আর্তনাদ করছে। কৃষ্ট্যালের সঙ্গে বস্তির সেই ধূর্জটিকে আমার মনে আছে, যে চোখ বুজে গান করেছিল, চোখের কোণে জল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু উড়িষ্যার পাহাড়ী টিলার জঙ্গলের হাতায়, ঝিঁঝি ডাকা রাত্রে এ ধূর্জটি আজ অন্যরকম। জীবনকে সে কোনোদিন এমনভাবে ব্যক্ত করে নি। আজ যেন সে এক স্বীকারোক্তি করছে। সে বললো, সমস্ত কবিতাটাই আমার ভালো লাগে। তোমাকে আমি একটা জায়গা থেকে বলছিঃ

চেয়ে দেখি আর মনে হয়,—
এ যেন আর-কোনো একটা দিনের আবছায়া।
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে

দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার শাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে;
সে আঙিনাতে আসন বিছায়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে;
সে আমকাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে—
তখন দোয়েল ডাকে সজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুর ঝোপে।
তখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে—
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

ধূর্জটি চুপ করলো, কিন্তু তখনো যেন তার গলার স্বর আমার কানে বাজতে লাগলো। বাজতে লাগলো, একই সঙ্গে, কবিতার কথাগুলো, আর তার সেই কাতরোক্তি, 'হে গুরুদেব, তুমি তাকে কোথায় দেখেছিলে, কোন্ পুকুরের ধারে। আমাকে একবারটি দেখতে দাও। আমার জীবনে তাকে এনে দাও।' কবিতার অংশ আবৃত্তি করার পরে দেখতে পাচ্ছি, ধূর্জটি যেন এক গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। পানীয়ের পাত্র সে স্পর্শ করছে না। ধূমপান করছে না। তার জন্য যে দুটি যুবতী সাকী ঘরের ভিতরে অপেক্ষা করছে, এখন সে কথাও মনেও আসছে না।

অনেকক্ষণ পরে যেন বহু দূর থেকে তার গলা শুনতে পেলাম, 'সাহিত্যিক, তোমাকে কি কিছু বোঝাতে পারলাম? দোহাই তোমার, তুমি যেন আমার আবৃত্তির প্রশংসা করো না। যা আমার একান্ত আপন কথা, এ কবিতা থেকে তা-ই আমি তোমাকে শুনিয়েছি।'

না, আমি ধূর্জটির আবৃত্তির প্রশংসা করবো না। জানি, পেশাদার শিল্পীর গলায় সে আবৃত্তি করে নি, যা শুনে আমরা হাততালি দিয়ে থাকি। বললাম, 'সবটা বুঝেছি, এ কথা বলতে পারবো না। তবে আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে, দূরকালের একটি ছবি যে আপনার মানস-পটে আঁকা হয়ে আছে, তা বুঝতে পারছি।'

ধূর্জটি বললো, 'ঠিকই বলেছ। রাঙা পাড় শাড়ি পরা সেই মূর্তিটি যার স্পর্শ করুণ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আঙিনায় আসন পেতে দেয়, আঁচল দিয়ে

ধ্বলো মোছে, প্বকুর ঘাট থেকে ছায়ায় ছায়ায় জল নিয়ে আসে, আর বিদায়ের সময়, একটি কথাও বলতে পারে না, কপাট ফাঁক করে শ্বধ্ব পথের দিকে চেয়ে থাকে, চোখ জলে ভেসে যায়—এই ছবি—'

ধ্বর্জটির গলার স্বর যেন র্বদ্ধ হয়ে এল। প্রায় মিনিটখানেক সে কোনো কথা বলতে পারলো না। আবার বললো, 'সে আর কী কথা বলবে সাহিত্যিক? সে যে সব কথার শেষ, তারপরে তে আর কথা থাকে না। কিন্তু এই যে আমি ধ্বর্জটিপ্রসাদ, আমি তো তাকে কোনোদিন দেখতে পেলাম না। তার আঙিনায় গিয়ে বসতে পেলাম না. তার ঠিকানা আমার চির অজানা। কে তার ঠিকানা দিতে পারে, আমি জানি না। যে দিতে পারে, সে আমাকে কোনোদিন দেবে না, কেন জানো?'

'কেন?'

'তাহলে যে ধ্বর্জটিপ্রসাদের ম্বক্তি ঘটে যাবে। তার যে সব পাওয়ানা পেয়ে যাবে। অর্থ বিত্ত স্বরা নারী, সব কিছ্বর বদলে, আমি তাকেই চেয়েছি। এমন কি—আমার স্ত্রী প্বত্র কন্যার পরিবর্তেও।'

আমি বিস্মিত চমকে ধ্বর্জটির দিকে তাকালাম। ধ্বর্জটি বললো, 'হ্যাঁ, এমন করে চমকে যেও না। জানি, নিবেদিতার কথা তোমার বিশেষ করে মনে হচ্ছে। স্বাভাবিক, নিবেদিতা স্বন্দরী, গ্বণবতী, আধ্বনিক নাগরিকাও বলতে পারো। সে তো আমার স্ত্রী। আমি তাকে নগ্ন দেখেছি। অপর্বপ তার দেহবল্লরী, যে কোনো প্বর্বষের কামনার ধন। কিন্তু আধ্বনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে, দ্বর কালের সেই ছবিটির জন্য যে আমার প্রাণ হাহাকার করে মরে যাচ্ছে। ভালবাসার তোমরা অনেক ব্যাখ্যা করেছ। সে সব আমি জানতে চাই না। আমি জানি, সেই ছবিটির নাম ভালবাসা। কোনো র্বপ গ্বণ জ্ঞান কর্তব্য দায় দায়িত্ব তা দিতে পারে না। সেই পরম রতন, সাধনার ধন। কিন্তু আমি যে, "সাধন ভজন জানিনে মা" তেমনি একজন সাধক।'

ধ্বর্জটি চুপ করলো। এখন তাকে আমি যেন অনেকখানি ব্বঝতে পারছি, তার কিছ্ব আগের কথা কয়টি আবার আমার মনে পড়লো, 'নিবেদিতা তার প্বত্র কন্যা সংসার নিয়ে স্বয়ংসম্প্বর্ণ সত্তা।' 'আমি একজন অপরিচিত। বহিরাগত।' 'আমরা কেউ কারোর দরজা খ্বলতে পারি নি।' কর্মী ভোগী সার্থক স্বযোগ-সন্ধানী শিকারী ধ্বর্জটিপ্রসাদ মিত্রের এই গভীর গোপন ব্যথার কথা এমন করে আর কখনো ব্বঝতে পারি নি। আমার অনেক দিনের জিজ্ঞাসার যেন জবাব পেলাম। এখন যেন ব্বঝতে পারলাম, কোন্ আগ্বনের লেলিহান শিখা নিয়ে সে ছ্বটছে, জ্বলছে, স্বখের ছদ্মবেশে আর্তনাদ করছে।

কিন্তু এ বিশ্বসংসারে সেই পরম রতনের আকাঙ্ক্ষা ক'জনের মেটে? তার চেয়েও বড় কথা, সে পরম রতনের অনুভূতি ক'জনের প্রাণে জাগে। যার জাগে, সে নানা রূপে ধূর্জটিপ্রসাদ।

হঠাৎ যেন ধূর্জটির ধ্যান ভাঙলো। বলে উঠলো, 'ধুত্তোরি যতো বাজে কথা। সাহিত্যিক তোমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছি, বোর ফীল্ করছো। নাও, মাল টানো।'

বলে সে যেন তীব্র তৃষ্ণায়, গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে পাত্র শূন্য করে দিল। বোতল থেকে আবার ঢাললো. আবার চুমুক দিল। হেঁকে বললো, 'কই রে, কোথায় গেলি তোরা? ছুঁড়িগুলোর নামও ভুলে গেলাম। রম্ভা না কাঞ্চন, তোরা আয়রে।'

বাংলোর ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে দুটি বেরিয়ে এল। তারাও মোটামুটি পান করেছে। খোঁপায় ফুল গুঁজেছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। উদ্ধত স্বাস্থ্য ঢেউ তুলে দুজনে এসে ধূর্জটির দু পাশে দাঁড়ালো। ধূর্জটি দু হাত বাড়িয়ে দুজনকে ধরলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চল্ গো আমার আগুন শিখা, পুড়তে পুড়তে মরি গিয়ে।'

যুবতী দুটি কী বুঝলো জানি না, ওরা ধূর্জটির দেহলগ্ন হয়ে হাসলো। ধূর্জটি বললো, 'গুড নাইট সাহিত্যিক।'

বললাম, 'আসুন দাদা।'

ধূর্জটি মেয়ে দুটিকে জড়িয়ে নিয়ে ঘরে যেতে যেতে গাইলো,

আ ম্বে প্রাণ! রূপে কী করে?
আমার মন মজেছে যারি সনে—
প্রাণো চাহে তারে।

টপ্পার ঢঙে গাইতে গাইতে যুবতীদ্বয়ের সঙ্গে সে ঘরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি যেমন বসেছিলাম, তেমনি চুপ করে বসে রইলাম। দূরে অন্ধকারে নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে, পাহাড়ের কালো রেখা। নীচে গভীর বনের অন্ধকার। ঝিঁঝিরা যেন এই রাত্রে বিশ্বের আপন কান্নায় বাজছে। আর আমার মনে হচ্ছে, ধূর্জটি তার গোপন গভীর ব্যথা আমার প্রাণেও চুঁইয়ে চারিয়ে দিয়ে গিয়েছে, যেমন করে মাটির বুকে জল চুঁইয়ে ঢোকে।

অতঃপর ধূর্জটির জীবনের একটি কাহিনী আমি ব্যক্ত করবো। যদিও এই ঘটনাটির অংশ-বিশেষ আমি উত্তমপুরুষে একবার প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু মূল ঘটনার অন্তঃ ও তাৎপর্য কিছুই সেখানে বলা হয় নি। ধূর্জটির জীবনে এ ঘটনার তাৎপর্য যেমন গভীর, তেমনি আমার কাছে মনে হয়েছিল, তার পরম রতনের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিস্ময়কর।

এ ঘটনাটিও ঘটে কলকাতা থেকে অনেক দূরে, মধ্য-ভারতের এক মনোরম অরণ্যভূমিতে। যাওয়া হয়েছিল অবিশ্যিই ধূর্জটির ব্যবসা-সংক্রান্ত কারণে কিন্তু কেবল ব্যবসা করে ফিরে আসা ধূর্জটির চরিত্রে নেই। কাজের শেষে তার আরো কিছু চাই, সেটা বরাবরই দেখে এসেছি।

আমরা যে বাংলোতে উঠেছিলাম, সেটি সরকারী। বাংলোটি বেশ বড়। আমরা যখন সেই বাংলোতে গিয়ে পোঁছুলাম, তখন সূর্য প্রায় ঢলে পড়েছে। অপরাহ্ণ বলতে যা বোঝায়, তা-ই। আগে থেকে কোনো খবর দেওয়া ছিল না। স্বভাবতঃই বাংলোর কেয়ারটেকার বা চৌকিদার আমাদের থাকতে দিতে একটু দ্বিধা করলো, এবং জানালো, একজন অফিসার সস্ত্রীক বাংলোতে রয়েছেন। তিনিও কলকাতা থেকে এসেছেন। তবে সেই অফিসার সাহেব বিশেষ প্রয়োজনে কাজের সফরে গিয়েছেন। একদিন পরেই তাঁর ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু আজ চার দিন হল, সাহেব আসেন নি। তাঁর স্ত্রী একলা রয়েছেন।

চৌকিদার ধূর্জটিপ্রসাদের চরিত্র জানে না। সে ধমকে হিন্দীতে বলে উঠলো, 'তুমকো কিস্স্যা শুন্‌নে কে লিয়ে, ম্যায় নহি ইধার আয়া। আভি ঠিক সে বাতাও, বাংলো মে কয়ঠো কামরা হ্যায়! য়ো সাব কয়ঠো কামরা আপনা জিম্মা মে রাখ্‌খা?'

ধূর্জটির রাজকীয় ঋজু চেহারা, এবং বাচনভঙ্গিতে বিশেষ কাজ হল। চৌকিদার হাত জোড় করে বললো, 'সাব, মেরা কসুর না লিজীয়ে। বাংলো মে চার কামরা হ্যায়। দো কামরা অফসর সাব আপনে জিম্মেমে রাখ্‌খা, দো আভিতক খালি হ্যায়।'

ধূর্জটি ধমকে বললো, 'তো এ কাহে নহি বাতাতা? ম্যায় ভি সরকারী কামমে আয়া। তুম লোগকো যেতনা অফসর হ্যায়, উসব মেরা বেগ্‌ মে রহতা।'

'জরুর হুজোর।'

'যাও, আভি কাম্‌রে কে দরবাজা খোলো, মেরা গাড়ি কা পিছে কা কোরিয়ার সে সামান্‌ উঠাও। তুমকো অফসর কো বিবি যো হ্যায়, উন্‌কো সাথ্‌ হমলোগ্‌ কা কোই দরকার নহি।'

চৌকিদার কী বুঝলো, জানি না। সে সেলাম ঠুকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল। সে একলা না, তার যুবতী স্ত্রীও আমাদের কাজে লেগে গেল। কামরা ঝাঁট দেওয়া, ডানলোপিলোর গদীর চাদর এবং বালিশের ওয়ার বদলানো সবই করলো। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য জমাদারও এসে গেল। ধূর্জটি চৌকিদারকে ডেকে, এক মুঠো করকরে দশ টাকার নোট তুলে দিয়ে বললো, 'চিকেনকারি, ডাল ঔর রোটি পাকাও, মিঠাই মো লায়েগা।'

সেই মুহূর্তেই চৌকিদার যেন ধূর্জটির গোলামের গোলাম হয়ে গেল। ধূর্জটিকে খুশী করার জন্য সে যে কী করবে, ভেবে না পেয়ে, অকারণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে সব কাজ অন্যের ওপরে দিয়ে, নিজে সব সময়ে, ধূর্জটির কাছে কাছে ঘুরতে লাগলো। আমার হাসি পাচ্ছিল।

বাংলোতে সবই ছিল, ছিল না কেবল বিজলী। তবে সময়টা শীতকাল। পাখার জন্য চিন্তা নেই। চৌকিদার জানালো, রাত্রে সে হ্যাজাক জেবলে দেবে। বাংলোর গঠনটি ভালো। চারদিকে সুন্দর করে সাজানো বাগান। বড় বড় গাছপালা ছায়াচ্ছন্ন। নানাবিধ পাখীর কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। এখানেও পাহাড় আর জঙ্গল পাশাপাশি মিশে আছে।

বাংলোর বারান্দার সামনে প্রথম ঘরটিই ডাইনিং হল। ডাইনিং হলের দুপাশে দুটি করে শোবার ঘর। আমরা এসে অবধি দেখতে পেয়েছি, একদিকের ঘরের দরজা বন্ধ। অর্থাৎ কলকাতার বাঙালী অফিসারের স্ত্রী সেই অংশে আছেন। স্বামী অনুপস্থিত বলেই বোধহয়, তিনি ডাইনিং হলের দিকের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। স্বাভাবিক। বাইরের লনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি, সেই অংশের দুই ঘরের জানালাগুলোও বন্ধ। ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। আমাদের ঘর দুটি দেখেই, ওপাশের দুটি ঘরের চিত্রও অনুমান করতে পারি। নিশ্চয়ই একই ধাঁচের। আমাদের দুটি ঘরের সংলগ্ন, আর একটি ছোট ঘর আছে, সেখানে ওয়ারড্রব আর ড্রেসিং-টেবল রয়েছে। এ্যাটাচাড্‌ বাথরুম একটাই। ডাইনিং হলের অপর অংশেও নিশ্চয় একই ব্যবস্থা। আমি ধূর্জটিকে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে মনে একটু অবাক লাগছিল, চৌকিদারের কথা শুনে। অফিসার ভদ্রলোক একদিনের কথা বলে বেরিয়ে চারদিন ধরে আসছেন না। কে জানে, ভদ্রলোকের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো কী না। অথবা কাজে-কর্মে আটকে গিয়েছেন।

ধূর্জটি আগে বাথরুমে ঢুকলো। আমি তখন একটু বাইরে পায়চারি

করতে লাগলাম। দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আকাশে তার রক্তাভা লেগেছে। সেই রক্তাভা যেন সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। গাছে গাছে পাতা ঝরছে। পাখীরা বাসায় ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। ঘুরতে ঘুরতে আমি বাংলোর পিছন দিকে গেলাম। খানিকটা গিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি যে বাংলোর অপর অংশের পিছনে এসে পড়েছি, খেয়াল করি নি। দেখলাম, এ অংশের ড্রেসিং রুমের খোলা দরজার সামনে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তিনি আমার মুখোমুখি নন। অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি তাঁর একটি পাশ মাত্র দেখতে পাচ্ছি।

মুহূর্ত পরেই মনে হল, মহিলা না বলে, তাঁকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একজন স্বাস্থ্যবতী তরুণী বলাই বোধহয় সঙ্গত। কারণ, তাঁকে দেখাচ্ছিল সেই রকম। মধ্য ভারতের এই বেলা-শেষের রাঙা-আলোয়, আমি দেখলাম, তরুণীটির চুল খোলা, পিঠ অবধি ছড়ানো, এবং বেশ ঘন আর কালো। এক পাশ থেকে হলেও, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার আয়ত টানাটানা চোখ, কাজল-মাখা নয়। নাকটি টিকলো। গায়ের রঙও বেশ ফর্সা। সে কাঁচুলির মতো, আধুনিক ছাঁটের লাল ব্লাউজ পরে আছে, এবং তা স্লিভলেস্‌। পিঠের এবং মেদবর্জিত পেটের অনেকখানি অংশ দেখা যাচ্ছে। সাদার ওপরে ঢাকাই জামদানি কাজ করা একটি সাড়ি তার পরনে। অবিন্যস্ত আঁচলের এক অংশে, ঠিক উদ্ধত না, ঈষৎ নম্র, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণী বুক দেখা যাচ্ছে। দেখে-শুনে মনে হল, তরুণী নাগরিকা, অর্থাৎ শহুরে। স্বাভাবিক, একজন অফিসারের স্ত্রীকে সহসা গ্রাম্য বলে ভাবা যায় না। এমন কি, আমার মনে হল, একটি বিদেশী সুগন্ধির হালকা গন্ধও যেন আমার ঘ্রাণে অনুভূত হচ্ছে।

সব দেখাটাই, কয়েকটি চকিত মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ মনে মনে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে পড়লাম। এভাবে কোনো মেয়েকে দেখাটা আমার রীতি-বিরুদ্ধ, তথাপি দেখলাম। আমি যে মুহূর্তে ফিরতে উদ্যত হলাম, সেই মুহূর্তেই তরুণী আমার দিকে ফিরলো। আমি তার সীমন্তে সিঁদুরের রেখা দেখতে পেলাম। সে একটু অবাক হল, তারপরে ভ্রূকুটি করে, দরজার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি একটু অন্যায়বোধে পীড়িত হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম।

ধূর্জটির স্নান এবং পোশাক পরিবর্তন তখন শেষ। ব্যবস্থা চমৎকার। চৌকিদার আমার জন্যও গরম জল রেখেছিল। স্নান করে পোশাক বদলে দেখি, ধূর্জটি বাংলোর বারান্দায় দোলায় বসেছে। টেবলের ওপরে তার স্কচ্‌ হুইস্কির বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, ছাইদানি। ডেকে

বললো, 'এসো। জায়গাটার সিনিক বিউটি আছে। বাংলোটাও চমৎকার।'

পাশের শোফায় বসে বললাম, 'খুবই সুন্দর।'

এই সময়ে চৌকিদার জলের জাগে জল ভরে, আর দুটি গেলাস এনে টেবলে বসিয়ে দিল। এখানে সোডা ওয়াটারের আশা করা যায় না। চৌকিদার বললো, 'হোজোর, হম দারু ডাল দেগা?'

ধূর্জটি বললো, 'ডালো।'

চৌকিদার যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে গেল। দেখা গেল, ঢালবার মাপটা তার অজানা না। পরিমাণ মতো হুইস্কি ঢেলে, জল মিশিয়ে দিল। তারপর প্রায় ধূর্জটির পায়ের কাছেই বসলো। ধূর্জটি হিন্দীতে বললো, 'হ্যাঁ বনোয়ারি, তুমি যেন কী বলতে চাইছিলে?'

চৌকিদারের নামটিও ধূর্জটির জানা হয়ে গিয়েছে। সে চোখ বড় করে, নিচু করে বললো, 'হ্যাঁ সাব্, আপনাকে আমি কথাটা বলতে চাই। আমি খুব মুশকিলে পড়েছি, ও-পাশের কামরার মেমসাহেবকে নিয়ে।'

ধূর্জটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রকম?'

বনোয়ারি বললো, 'সাহেব তো একদিনের নাম করে গেলেন। আজ চার দিন হয়ে গেল, এখনো এলেন না। এদিকে আমার নিজের খরচে মেমসাহেবকে খাওয়াতে হচ্ছে।'

'সে কি হে, সাহেব তোমাকে টাকা দিয়ে যাননি?'

'না হুজোর।'

'তা না দিলেও, মেমসাহেবের কাছে নিশ্চয়ই টাকা আছে?'

'তবে আর আপনাকে বলছি কী হুজোর। মেমসাহেবের কাছে বাজারের টাকা চাইতে গেলাম। মেমসাহেব বললেন, তার কাছে নাকি একটি পয়সাও নেই।'

ধূর্জটি এবার আমার দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমিও সেভাবেই তার দিকে তাকালাম। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য আর অভাবনীয় বলে মনে হল। কোনো ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারেন, বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া, এরকম একজন মহিলার হাতে সামান্য দশ-বিশটা টাকাও নেই, এ-কথাও যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

ধূর্জটির মতো ব্যক্তিও যেন বিভ্রান্ত হয়ে বললো, 'এ তো তুমি ভারি অবাক কথা শোনালে হে। তোমার কি মনে হয় সাহিত্যিক?'

আমি বললাম, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে মহিলাটিকে আমি কয়েক পলকের জন্য দেখেছি।'

'তাই নাকি? কখন?'

'আপনি তখন চান করছিলেন।'

বলে আমি তরুণীর বর্ণনা দিলাম। ধূর্জটি আমাকে একটু উপহাস করে বললো, 'হুঁ, একেবারে তক্ষকের নজর। ঠিক দেখে নিয়েছ। কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে বল তো?'

'আমি কিছুই অনুমান করতে পারছি না।'

ধূর্জটি বনোয়ারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'সাহেব কি গাড়ি নিয়ে এসেছেন?'

'জী হ্যাঁ।'

'উনি কোন্ অফিসের অফিসার?'

'তা তো জানি না হুজোর।'

ধূর্জটি চুপচাপ গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'দূর এসব ঝুট ঝামেলার ভাবনায় আমাদের কী দরকার। নিজেদের ভাবনা ভাবা যাক। যাদের ব্যাপার তারা বুঝবে। শোনো বনোয়ারি।'

বনোয়ারি ধূর্জটির দিকে ঝুঁকে পড়লো। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম. ধূর্জটি কী বলতে যাচ্ছে। সে নির্দ্বিধায় বললো, 'তোমাদের এখানে লেড়কি-টেড়কি পাওয়া যায়?'

বনোয়ারি প্রথমটা যেন বুঝতে পারলো না। কিন্তু তার গোঁফ-জোড়া আর ধূর্ত চাহনি দেখে বুঝলাম, সে বেশ ঘুঘু। জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যায়সা লেড়কি সাব?'

ধূর্জটি বললো. 'ক্যায়সা আবার, যোয়ান আওরত পাওয়া যায় কী না বলো। গেলে, নিয়ে এসো, তোমাকে খুশি করে দেব।'

আমি বলে উঠলাম, 'এ-রকম ক্ষেত্রে, কলকাতা থেকে আপনার কোনো বান্ধবীকে নিয়ে এলেই তো পারেন।'

ধূর্জটি বললো, 'দ্যাখো, সঞ্জীবচন্দ্রের সেই কথাটা মনে কর. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। কলকাতার বান্ধবীরা কলকাতাতেই থাক। যখন যেখানে যাই, সেখানকার বান্ধবীই ভালো।'

বনোয়ারি বললো. 'মিলতে পারে হুজোর, তবে বাঙালী পাবেন।'

'বাঙালী?'

'হ্যাঁ সাব্। এখান থেকে কিছু দূরে বাঙালীরা আছে. সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে।'

ধূর্জটি আর আমি দুজনেই দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ধূর্জটি বললো, 'নিয়ে এসো দেখি তোমার বাঙালী লেড়কি।'

বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে, মধ্যভারতের উদ্বাস্তু বাঙালীদের ছবি ভেসে উঠলো।

ঘণ্টাখানেক পরে, বনোয়ারি এসে জানালো, মেয়েটি রাত্রি দশটায়

আসবে। তার আগে আমরা খেয়ে নিলে ভালো হয়। ধূর্জটি বললো, 'তাই হবে। তোমার মেমসাহেব কখন খাবেন?'

বনোয়ারি বললো, 'মেমসাহেব আজ দিনেও খাননি, রাত্রেও খাবেন না বলেছেন।'

কথাটা শোনা মাত্র আমার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠলো। ধূর্জটি বললো, 'কী যন্ত্রণা। এ-সব কথা কানে না এলেই ভালো হতো। একজন উপোস দিয়ে পড়ে থাকবে, আর আমরা গিলবো কুটবো, ভাবতে খারাপ লাগে। অবিশ্যি আমাদের কিছু করবারও নেই। কী বলো হে সাহিত্যিক।'

বললাম, 'তা তো বটেই। আমরা তাঁকে কিছুই বলতে পারি না। তিনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, আমরা দুজন বাঙালী এখানে এসে উঠেছি। তবু তিনি কিছুই বলতে আসেননি।'

ধূর্জটি বললো, 'যেচে উপকার করতে যাওয়া বড় বিপজ্জনক।'

সে বনোয়ারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'মেমসাহেব আমাদের খবর কিছু জানেন কী না।' সে বললো, জানেন। অতঃপর আর কোনো কথাই থাকতে পারে না। রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টায় আমরা খেতে বসলাম। বনোয়ারির স্ত্রী রান্না করেছে, খাদ্যের স্বাদ ভালোই উপভোগ করা গেল। খেয়ে উঠতে উঠতে দশটা বাজলো। ধূর্জটি তারপরেও আবার পানীয় নিয়ে বসলো। আমি শুতে যেতে চাইলাম। সে বললো, 'বঙ্গবালাটিকে একবার দেখে যাও।'

সে কৌতূহল অবিশ্যি আমার ছিল। কিন্তু প্রায় তিনশো মাইল দৌড়ে, আমার ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল। যদিও আমার চেয়ে, ধূর্জটিরই বেশী ক্লান্ত হওয়ার কথা। কেননা, সে গাড়ি ড্রাইভ করেছে। কিন্তু তার ক্ষমতা অনেক বেশি, সে অফুরন্ত, অক্লান্ত।

আমরা বাইরের বারান্দা থেকে, ঘরে এসে বসলাম। বনোয়ারি বারান্দায় হ্যাজাক নিভিয়ে দিয়েছে। অমাদের ঘরের সামনে, ডাইনিং হলের দরজাটা ভেজানো। কিন্তু বারান্দার দিকের দরজা খোলা। ধূর্জটির অভিসারিকা সেই দরজা দিয়ে আসবে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় সে এল। বনোয়ারি তাকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। দেখলাম, কুড়ি-একুশ বছরের একটি কালো মেয়ে। স্বাস্থ্যটি পুষ্ট। তেল-তেলে চুলে খোঁপা বাঁধা। খোঁপায় চন্দনের বীচির মতো লাল লাল কাঁটা গোঁজা। একটি ডোরাকাটা মিলের শাড়ি, আর লাল রঙের প্রায় কনুই অবধি হাতওয়ালা জামা। হাতে লাল কাঁচের চুড়ি। আলতা-পরা পায়ে স্যাণ্ডেল। মুখখানি কালোর ওপরে মোটামুটি মিষ্টি।

ধূর্জটি ব'লে উঠলো, 'বাহ্, নাক বোঁচা-বোঁচা চোখ ভাসা-ভাসা, সেই মেয়েটি দেখতে খাসা। এসো গো রূপসী কালিন্দী। তোমার পায়ে দেব জবাফুল, তারপরে যথাবিহিত পূজা করব।'

বলে নিজেই মেয়েটিকে হাত ধরে, ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। মেয়েটি লাজুক হাসলো, চোখে ঝিলিক হানলো।

ধূর্জটি জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়ি কোথায় ছিল?'

মেয়েটি বললো, 'শুনেছি বরিশালে বাড়ি আছিলো, আমার কিছু মনে নাই।'

'বাহ্, চমৎকার বুলি।'

বলে তাকে খাটে বসিয়ে দিল। সেই মুহূর্তেই ঘটলো সেই বিস্ময়কর ঘটনা। ডাইনিং হলের দিকের দরজায় আবির্ভাব হল এক নারীর। সেই তরুণী, অপর অংশের সেই অফিসার পত্নী। তার চোখে যেন একটু রক্তিম, ভ্রূকুটি তীক্ষ্ম দৃষ্টি। শাম্পু করা খোলা চুলে, সেই পোশাকই তার অঙ্গে, কিন্তু বুকের আঁচল স্খলিত। সে একবার ধূর্জটি আর আমার দিকে দেখে বললো, 'এরকমই অনুমান করেছিলাম।'

বলেই সদ্যাগত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে, দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'যাও, চলে যাও এখান থেকে।'

এরকম অবস্থায় জীবনে পড়িনি। তরুণী মহিলাটির সামনে যেন মরমে মরে গেলাম। ধূর্জটিও রীতিমতো বিভ্রান্ত। সে উচ্চারণ করলো, 'মানে?'

তরুণী বললো, 'মানে আপনাকে পরে বোঝাচ্ছি।'

বলে মেয়েটির দিকে ফিরে আবার কঠিন গলায় বললো, 'চলে যাও।'

ধূর্জটি খুব সহজে ছাড়বার পাত্র না। বললো, 'আপনাকে কোনোরকম ডিসটার্ব করা হয়নি। তবু আপনি যখন বলছেন, ওকে আমি চলে যেতেই বলবো। কিন্তু তার আগে আমি ওকে কয়েকটা টাকা দিতে চাই। ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

তরুণী বললো, 'নিশ্চয়ই।'

ধূর্জটি তার পার্স থেকে পাঁচটি টাকা বের মেয়েটিকে দিল। মেয়েটি তখন খাট থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে বিস্ময় ও শঙ্কা। টাকাটা নিয়েই সে অদৃশ্য হল। তরুণী এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ধূর্জটির দিকে ফিরে তাকালো। তারপরে যে কথা শুনলাম, নিজের শ্রবণকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। তরুণীটি পরিষ্কার বললো, 'যে কারণে মেয়েটিকে ডাকা হয়েছিল, তা আমি জানি। তবে আপনাদের উপোস করে থাকতে হবে না, কিন্তু খরচটা একটু বেশি

লাগবে।’

ধূর্জটির নেশা বোধহয় কেটেই গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলো, ‘তার মানে?’

তরুণী তার সর্বাঙ্গে একটা দোলা দিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, ‘তার মানে আমিই আছি। ওই মেয়েটার তুলনায়, আশা করি আমি নিরেস নই?’

ধূর্জটি ভ্রূকুটি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকালো। আমার মনে হল, কয়েকদিনের নিরন্তর উদ্বেগের এবং একদিনের অনাহারে ভদ্রমহিলার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি সাহস সঞ্চয় করে বললাম, ‘বুঝতে পারছি, স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায়—।’

আমার কথার মাঝখানে তরুণী খিলখিল করে হেসে উঠলো। তার যৌবন টল্‌টল্‌ দেহবল্লরী কেঁপে কেঁপে উঠলো। বললো, ‘স্বামী? কে আমার স্বামী নয়। আপনি আমার স্বামী, উনি আমার স্বামী, পৃথিবীর সব পুরুষই আমার স্বামী।’

বলেই টেবিলের ওপর বোতল গেলাসের দিকে তাকালো। আবার বললো, ‘বাহ্‌ চমৎকার, বিলিতি মদ! একটু কাঁচাই খাওয়া যাক। এতক্ষণ ধরে চোলাই খাচ্ছিলাম।’

বলে কোনোরকম দ্বিধা না করে, হুইস্কির বোতল নিয়ে, ছিপি খুলে, গলায় নীট্‌ হুইস্কি ঢেলে দিল। মুখটা কুঁচকে একটা শব্দ করলো, ‘আহ্‌!’

আমি আর ধূর্জটি তখনো প্রস্তরবৎ এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছি। ধূর্জটিকে আমি কখনো এত বিস্মিত আর বিভ্রান্ত হতে দেখিনি। আমারই মতো, তার জীবনেও এরকম ঘটনা নতুন এবং অবিশ্বাস্য। তরুণীর চোখ আগেই একটু রক্তিম দেখেছিলাম। সেটা কান্নার জন্য ভেবেছিলাম। সে ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে বললো, ‘কি মশাই রাগ করছেন, না বলে মদ খাচ্ছি বলে?’

ধূর্জটি যেন একটু ধাতস্থ হয়েছে। বললো, ‘না, রাগ করছি না, কিন্তু ব্যাপারটা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।’

তরুণী ঘাড় হেলিয়ে, চোখের কোণে তাকিয়ে বললো, ‘কেন এতে বোঝাবুঝির কী আছে? একজন ভাঁওতা দিয়ে কেটে পড়েছে, আপনারা এসে পড়েছেন। আর আপনাদেরও একটা মেয়ে চাই। তাই চলে এলাম। তবে হ্যাঁ, আগেই বলছি, খরচটা একটু বেশি লাগবে। কেন না, চৌকিদারের খাবারের খরচটা মেটাতে হবে, কলকাতা যাবার ভাড়াটা দরকার, পথেও কিছু খরচ আছে।’

ধূর্জটি চকিতে একবার আমার দিকে দেখে নিয়ে বললো, ‘তার মানে আপনি বলতে চান, যার সঙ্গে এসেছেন, উনি আপনার স্বামী নন?’

তরুণী চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'উনি আমার পেয়ারের—।'

একটি অশ্লীল বিশেষণ উচ্চারণ করলো। আবার বললো, 'এখন আপনারাও আমার তা-ই। বাড়ি আমার কলকতার খাস পাড়ায়। তবে ও মেয়েটার থেকে বোধহয়, আমাকে খুব খারাপ লাগবে না, কী বলেন?'

বলেই সে শরীর বাঁকিয়ে, বুক উঁচিয়ে দাঁড়ালো। তারপরে হেসে উঠে, আবার বোতল তুলে গলায় ঢাললো। ঢেলে, বোতলটা টেবিলে রেখে খাটে বসলো। আঁচলটা বুক থেকে সম্পূর্ণ লুটিয়ে পড়লো নিচে। মেদবর্জিত শাড়ির বন্ধনী নাভির নিচে। পা দুটো সে অনেকখানি ফাঁক করে বসলো। ইতিমধ্যে ধূর্জটি তার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করলো, 'নামটা জানতে পারি?'

তরুণী বললো, 'নিশ্চয়ই। কলকাতার ওপাড়ায় যাতায়াত থাকলে, নিশ্চয়ই আমার নামও শোনা আছে। আমার নাম অমিতা।'

ধূর্জটি বললো, 'তুমি খুব একটা সারপ্রাইজ দিয়েছ বটে, তবে ভালো লাগলো তোমাকে দেখে। তা তোমার বাবুটি হঠাৎ এরকম করলো কেন?'

অমিতা নাম্নী তরুণী বললো, 'বোধহয় অন্য কোথাও কিছু জুটে গেছে, সেখানেই জমে গেছে। ব্যাটা একটা টাকা পর্যন্ত রেখে যায়নি। আর বাইরে টাইরে এলে, গয়নাগাটি নিয়ে বেরোই না। কে জানে বাবা, কিসের থেকে কী হবে। যাক, তাহলে আমাকে ভালো লেগেছে তো?'

ধূর্জটি সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা না এসে পড়লে কী করতে?'

অমিতা হাত উল্টে বললো, 'জানি না। এখন তো মনে হচ্ছে, আমার হয়ে, ভগবানই আপনাদের এখানে এনে দিয়েছে।'

'তা একরকম বলতে পারো। কিন্তু আমাদের ঘরে তুমি এলে, তোমার লোক ফিরে এসে যদি হুজ্জোত বাঁধায়?'

অমিতা একটা পা তুলে দেখিয়ে বললো, 'মুখে ওর লাত্থি মারবো। ও চুক্তি রাখেনি, আমিও রাখবো না। যার কাছে খুশি, আমি তার কাছেই থাকবো। আমি কারোর ঘরের বৌ না।'

যতো শুনছিলাম, ততোই অবাক হচ্ছিলাম। এখন আর সন্দেহ নেই, অমিতা একজন গণিকা। কিন্তু তার কথাবার্তা ভাবভঙ্গির মধ্যে কোথাও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে তাকে খুব সাধারণ বলা যায় না। এ ঘরে প্রথম এসে, সে যেভাবে সেই মেয়েটিকে চলে যাবার আদেশ করেছিল, তা যেন একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার পক্ষেই সম্ভব। নিজের অসহায় অবস্থা এবং অকুণ্ঠ আত্মপরিচয়ের ভঙ্গির মধ্যেও যেন একটা বলিষ্ঠতার ছাপ আছে।

ধূর্জটি তার গেলাসে চুমুক দিল। অমিতা বললো, 'নিন চলে আসুন, আর দেরি কেন? বলেন তো কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতে পারি, আমার আপত্তি নেই।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আমি তাহলে শুতে যাই।'

ধূর্জটি বললো, 'আরে বসো বসো।'

মেয়েটির দিকে ফিরে বললো, 'তোমার এত তাড়া কিসের?'

অমিতা বললো, 'আমার কোনো তাড়া নেই, আপনাদের জন্যই বলছি।'

ধূর্জটি বললো, 'আমাদেরও কোনো তাড়া নেই। কিন্তু তোমার তো কিছু খাওয়া দরকার। আজ তো সারাদিন কিছু খাওনি শুনলাম।'

অমিতা হাত উল্টে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'ওরকম এক-আধদিন না খেলে কিছু যায় আসে না। আমাকে বরং একটু মদ দিন।'

লক্ষণীয়, অমিতা কিন্তু ধূর্জটিকে 'তুমি' করে বলছে না। ধূর্জটি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে, জল মিশিয়ে ওকে দিল। অমিতা সোজা হয়ে বসে বললো, 'বসুন না। আপনিও বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?' বলে আমার দিকে তাকালো।

তার আপ্যায়নের ভঙ্গি দেখলে, সহসা বুঝে ওঠা যায় না, সে একজন দেহোপজীবিনী মাত্র। ঘরে দুটি চেয়ারই ছিল। ধূর্জটি অমিতার মুখোমুখি বসলো। সে আমাকেও বসতে বললো। 'বসো সাহিত্যিক, তোমাদের জীবনে তো শুনেছি নাকি, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। আজ তোমাকে আমি কিছু দেখাচ্ছি না, দর্শনীয় ঘটনা আর চরিত্র দৈবরূপে এসেছে।'

কথাটা মিথ্যা না। অমিতা আমার দিকে দেখে ধূর্জটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'উনি সাহিত্যিক নাকি? নামটা শোনা যেতে পারে না?'

ধূর্জটি একবার আমার দিকে দেখে, নামটা বললো। অমিতা তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ফিরে, গেলাস শুদ্ধ কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'কী সৌভাগ্য আমার! আমি যে আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা। জীবনে আপনাকে কোনো দিন দেখতে পাবো, ভাবিনি। তাও কী না, এখানে, এই জঙ্গলে, এ অবস্থায়?'

আনন্দিত বা সম্মানিত বোধ করবো কী না, বুঝতে পারছি না। কলকাতার একজন দেহোপজীবিনী আমার ভক্ত পাঠিকা, এরকম কথা আমার জানা ছিল না। আমার এক অধ্যাপক-সাহিত্যিক সমালোচক বন্ধু একবার, কোনো একজন সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে বলেছিলেন, 'অমুক লোকটি ঝি-চাকরানীদের সাহিত্যিক।' আমার জীবনে কিছু ঝি-চাকরানী দেখা আছে, যারা অনেক ভদ্রমহিলার থেকে সভ্য, শালীন এবং অল্প-সল্প

আক্ষরিক জ্ঞান থাকাতে, তারা পড়াশোনাও করে। অমুক সাহিত্যিকের লেখা ছাড়াও তারা অন্য সাহিত্যও পড়ে। যদিও অস্বীকার করা যাবে না, এক্ষেত্রে ঝি-দের থেকে সাহিত্যিককেই আক্রমণ করা হয়েছে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক অপাঠ্য বই-ই বাজারে ছড়ানো আছে। তথাপি কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল, ঝি-চাকরানীদের প্রতি কটাক্ষটা একটু রূঢ় আর কঠিন মনে হয়েছিল।

যাই হোক, অপাততঃ অমিতার কথা শুনে, আমার এ কথাই মনে হল, আমার পাঠক-পাঠিকা সম্পর্কে আমার কতোটুকু ধারণাই বা আছে। মুদ্রিত অক্ষরে একবার যা প্রকাশিত হয়, তখন তা কোন্ জগৎ থেকে, কোন্ জগতে যে সঞ্চরণ করে বেড়ায়, তা বলা যায় না। অতএব অমিতা আমার বই পড়বে, এতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু সে একটু আশ্চর্য করলো, যখন আমার কোনো কোনো বইয়ের নাম করলো, এবং সেই সব বইয়ের চরিত্রদের বিষয়ে, কিছু কিছু মন্তব্য করলো। তারপরে বললো, 'দেখবেন, আমার মতো মেয়েমানুষের মুখ থেকে এসব শুনছেন বলে রাগ করবেন না যেন।'

ধূর্জটি বলে উঠলো, 'ওর রাগ করার কোনো অধিকারই থাকতে পারে না। ও বই লিখেছে, তুমি কিনে পড়েছ। সে বই সম্পর্কে তোমার বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।'

অমিতা বললো, 'তাহলেও, আমাদের পরিচয়টা তো আলাদা। আমরা হলাম সমাজের আবর্জনা।'

কথাটা বলেই অমিতা খানিকটা যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো। ধূর্জটি বলে উঠলো, 'কিংবা বলতে পার সমাজের অনেক আবর্জনাকেই আমরা চিনতে পারি না। তবু তোমাদের আবর্জনা ভেবে নিজেদের মনকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারি।'

আমি অমিতাকে বললাম, 'আমার ভালো লাগলো, আপনি কেবল আমার ভক্ত পাঠিকা নন, সমালোচকও। তবে এটা ঠিকই, এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।'

অমিতা জিজ্ঞেস করলো, 'অভিজ্ঞতা? কী অভিজ্ঞতা?'

'আপনারাও আমাদের বই পড়েন।'

অমিতার মুখে পানীয়ের রক্তোচ্ছ্বাস। ঘাড় কাত করে হেসে বললো, 'তাহলে বলবো, এটা আপনার সত্যি নতুন অভিজ্ঞতা আমার দ্বারা হল। জেনে রাখুন, আমরা অনেকেই আপনাদের বই পড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এঁদের বই তো কম-বেশি সবই পড়েছি। তবে বলতে পারেন, সবই যে বুঝেছি, তা নয়। তাছাড়া, এমন অনেক বই আছে, পণ্ডিত না হলে

যে সব বই পড়া যায় না, তা পড়ি না।'

এ সব কথার মধ্যেই অমিতা তার পানীয় শেষ করলো। আঁচল তার তেমনি মেঝেতে লুটানো, গায়ে তুলে নেবার দরকার বোধ করেনি। অথবা তার খেয়ালই নেই। কিন্তু প্রথম দিকে তাকে যেরকম উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, বা যতোটা মাতাল এবং উগ্র মনে হয়েছিল, এখন তা মনে হচ্ছে না। এখন আলাপ আলাপনে, আমি তো প্রায় বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছি, একজন পণ্যাঙ্গনার সঙ্গে কথা বলছি। গেলাসের পানীয় শেষ করে, শূন্য গেলাসটি ধূর্জটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, চোখে একটু ঝিলিক দিয়ে বললো, 'আর একটু পেতে পারি?'

ধূর্জটি বললো, 'পেতে নিশ্চয়ই পারো, কিন্তু খেয়ে শেষে গোলমাল করবে না তো?'

'কী গোলমাল?'

'এই বমি-টমি করে শরীর খারাপ করবে হয় তো।'

অমিতা হেসে একটু লুটিয়ে পড়ার ভঙ্গি করে বললো, 'আজকাল আর বমি-টমি হয় না। আগে হতো, প্রথম প্রথম যখন খেতাম। এখন তো ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত, এই একটি বস্তু আছে। তবে গোলমাল যে একেবারেই করি না, তা বলতে পারি না।'

ধূর্জটি বললো, 'সেটা কী রকম?'

অমিতা বললো, 'অনেক সময় জিনিসপত্র ভাঙচুর করি। তাতে অবিশ্যি নিজের ক্ষতিই করি। নিজের আলমারি, গ্রামোফোন, ড্রেসিং টেবিল অনেকবারই নষ্ট করেছি, পরে আফসোস করে মরেছি।'

ধূর্জটি বললো, 'সর্বনাশ, তুমি কি শেষে বাংলোর আসবাবপত্র ভাঙতে আরম্ভ করবে নাকি?'

অমিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো, উপুড় হয়ে পড়লো। তার মুখ চুলে ঢেকে গেল। আবার মুখ থেকে চুল সরিয়ে বললো, 'না না, আজ সেরকম কিছু হবে না।'

'কী করে জানলে হবে না?'

'সব দিন হয় না।'

'কোন্ কোন্ দিন হয়, সেটা তাহলে শুনি?'

অমিতা আবার হেসে উঠে বললো, 'আপনি তো জ্বালালেন দেখছি মশাই। মানুষের মন কি সবদিন এক রকম থাকে?'

'না, আমার জানা দরকার, মনের অবস্থা কী রকম থাকলে তুমি জিনিসপত্র ভাঙাচোরা কর।'

অমিতার হাসি আর থামতে চায় না। তারপরে হাসিটা হঠাৎ থামিয়ে

বললো, 'এক-একদিন মনে হয় না, এ জীবনের কিছুই ভালো লাগে না, সহ্য হয় না। সব ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলি? নিজেকে শুদ্ধ শেষ করে দিই?'

ধূর্জটি কয়েক মুহূর্ত অমিতার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে অমিতার গেলাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে বললো, 'কিন্তু ভাঙচুর করে কি জ্বালা মেটানো যায়?'

অমিতা বললো, 'মোটেই না। কিন্তু তখন যে সে-সব মনেই থাকে না। বললাম তো আপনাকে, তারপরে আফসোস করে মরি। শরীর খাটিয়ে শখের জিনিসগুলো কিনি, নিজের হাতেই আবার সেগুলো ভেঙেচুরে ফেলি।'

ধূর্জটি অমিতার হাতে পানীয়র গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কিন্তু তোমার জ্বালাটা কিসের?'

পানীয় রসের উচ্ছ্বাসেই বোধহয় অমিতার ঠোঁট টকটকে লাল দেখাচ্ছে। ঠোঁট উল্টে বললো, 'সে-সব ছাই কিছুই বুঝি না। বুঝলে তো ভালো হতো।'

সে গেলাসে চুমুক দিল। ধূর্জটির মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছে. সে যেন কিছু চিন্তা করছে। অমিতা আমাকেও একটু ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু সে যে বললো, কিসের জ্বালা, সে-সব সে কিছুই জানে না, তা কি সত্যি? অবিশ্যি হতেও পারে। মানুষ তার মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যা সব সময়ে করে উঠতে পারে না। কিন্তু বারোরামা রমণীদের চিরদিন রঙ্গিণী বলেই জেনেছি। তাদের কোনো জ্বালা যন্ত্রণা থাকতে পারে. এ-কথা কখনো মনে হয়নি।

অমিতা হঠাৎ বলে উঠলো. 'তবে দেখবেন মশাই, আমাকে কোনো উপদেশ টুপদেশ দিতে আরম্ভ করবেন না। দোহাই আপনার।'

ধূর্জটি হেসে উঠলো, বললো, 'হঠাৎ তোমার এ কথা মনে হল কেন. আমি উপদেশ দিতে পারি?'

অমিতা বললো, 'বলা যায় না, অনেকে এরকম আছে. যে'চ উপদেশ দিতে আরম্ভ করে।'

ধূর্জটি বললো, 'সেরকম বুদ্ধু আমি নই, যে তোমাকে উপদেশ দিতে যাবো। তাছাড়া, আমাকে কে উপদেশ দেয়, তার নেই ঠিক, আমি যাবো তোমাকে উপদেশ দিতে? তাও কী না একটা বেশ্যাকে?'

কথাটা আচমকা এত রূঢ় শোনালো, আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম, ধূর্জটির ঠোঁটে তীব্র বিদ্রূপের হাসি। অমিতা ঘাড় বাঁকিয়ে ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে, হাসি মুখেই বললো, 'যাক, আপনি যে মনে রেখেছেন. আমি

একটা বেশ্যা, তবু ভালো। কিন্তু যেরকম আলাপ-সালাপ শুরু করেছেন, ভাবলাম শেষটায় আমাকে হয়তো উপদেশ দিতে আরম্ভ করবেন। সেরকম কিছু বোকা বুদ্ধু বাবু-টাবু আমাদের ঘরে আসে কী না।'

ধূর্জটি বললো, 'না, আমি সেরকম বাবু নই। নিজের চোখেই দেখছ, আমি মেয়েমানুষ ঘরে ডাকিয়ে এনেছিলাম। সেটা মদ্যপান করে, খাটে শুয়ে উপদেশ দেবার জন্য নয় নিশ্চয়ই?'

অমিতা বললো, 'সে আমি জানি, আপনি পুরো লাইনের লোক। তা না হলে আর এ জঙ্গলে মেয়েমানুষ যোগাড় করতে পারেন?'

ধূর্জটি কঠিন করে জিজ্ঞেস করলো, 'লাইনের লোক মানে?'

আমি একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ঘটনা যেন অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। অমিতা হাসছে, তার রক্তিম চোখ ঢুলুঢুলু, ঠোঁট ধনুকের মতো বাঁকা। সে যেন ফণাতোলা সাপের মতো দুলছে। বললো, 'সেটাও শুনতে চান? জানেন না? লাইনের লোক মানে, আপনি একটি মাগীবাজ।'

ঝটিতি ধূর্জটির আজানুলম্বিত শক্ত হাত উঠলো, সবেগে গিয়ে পড়লো অমিতার গালে। অমিতার হাত থেকে গেলাস ছিটকে পড়লো। আঘাতের চোটটা সামলাতে না পেরে, অমিতা খাটের ওপর কাত হয়ে পড়লো। আমি চেয়ার থেকে উঠে ডেকে উঠলাম, 'ধূর্জটিদা!'

ধূর্জটিকে অনেক সময় অনেক কারণে রাগতে দেখেছি। তাকে আমি লোকের সঙ্গে মারামারি করতেও দেখেছি। কিন্তু কখনো কোনো মেয়ের গায়ে হাত তুলতে দেখিনি। বরং তার মুখেই আমি শুনেছি, 'মেয়েদের গায়ে যারা হাত তোলে, তাদের তুল্য পাপী আর কেউ নেই। সে মেয়ে যেমন মেয়েই হোক। মেয়েদের যারা যত্ন করতে জানে না, তারা দুর্ভাগা।'

সেই ধূর্জটিকে আজ আমি এ কি করতে দেখছি। সে আমার ডাক শুনতে পেল না, আমার দিকে ফিরে তাকালো না। সে কাত হয়ে পড়া অমিতার গালে, আবার সজোরে একটা থাপ্পড় মারলো। তার চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। নিচু স্বরে গর্জন করে বললো, 'যতো বড় মুখ নয়, ততো বড় কথা?'

এবার আমি ছুটে এসে, ধূর্জটির হাত চেপে ধরলাম। বল্লাম, 'কী করছেন ধূর্জটিদা। আপনি এত আত্মভোলা হয়ে গেলেন? আপনাকে তো আমি কখনো এরকম করতে দেখিনি।'

ধূর্জটি আমার সে কথার কোনো জবাব দিল না। তখনো তার বাঁ হাতে পানীয়ের গেলাস। অনেকখানি চলকে পড়ে গেলেও, অবশিষ্ট সে এক চুমুকে শেষ করলো। টেবিলের কছে সরে গিয়ে গেলাসে আবার পানীয় ঢালতে লাগলো। আমি অমিতার দিকে তাকালাম। তার মুখ টকটকে লাল,

গালে আঙুলের দাগ ফুটে আছে। একটা চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরোবার উপক্রম করছে। ঠোঁটের কোণ ফেটে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। সে উঠতে গিয়ে, প্রথমে উঠতে পারলো না। তারপর চেষ্টা করে উঠে বসলো। ভাবলাম, এবার সেও একটা কিছু ঘটাবে। কেননা, তার মেজাজের পরিচয়, এবং ক্ষেপে যাওয়ার কথা একটু আগেই শুনেছি। কিন্তু আমি তার চোখে কোনোরকম ক্রুদ্ধ অঙ্গার ঝিলিক দেখলাম না। সে আঁচলটা টেনে তুলে, নিজের বুকের ওপর ঢাকা দিল। দু' হাতে চুলের গোছা মুখ থেকে সরালো। কিন্তু চোখের দৃষ্টি একবারও ধূর্জটির দিক থেকে সরালো না। সে উঠে দাঁড়াতে গেল, পারলো না। আবার বসে পড়লো। আমার মনে পড়লো, সারাদিন মেয়েটি কিছুই খায়নি, কেবল মদ্যপান ছাড়া। তার ওপরে এই আঘাত।

অমিতা বসে থেকেই, রক্ত চোঁয়ানো ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বললো, 'আমি যা, তা আপনি বলতে পারেন, আপনি যা তা বললেই দোষ?'

আমার মনে হল, অমিতার চোখে যেন জল টলটল করছে। কিন্তু একটা চোখে যেন সত্যি রক্ত ফুটে বেরোচ্ছে। গালের দাগগুলো আরো ফুলে উঠেছে। ধূর্জটি তার কথার কোনো জবাব দিল না। অন্য দিকে তাকিয়ে, গেলাসে চুমুক দিল।

অমিতা আবার বললো, 'আমাকে মারাটা আর এমন কি বড় কাজ। আমাকে আপনি আরো মারতে পারেন। কিন্তু দুটো কথা মনে রাখবেন। এক—আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। দুই—এখন বুঝতে পারছেন তো, মানুষের মন সব সময় একরকম থাকে না?'

বলে সে এবার ঘুরে গিয়ে দু' হাতে ভর দিয়ে ঠেলে উঠে দাঁড়াতে গেল, এবং সে ভাবেই কয়েক মুহূর্ত রইলো। তার গলার স্বর অবিকৃত বটে. কিন্তু আমি তার চোখের কোল বেয়ে জল পড়তে দেখলাম। তার গলার স্বরে শোনা গেল, 'আমাকে মেরে যদি আপনার জ্বালা মিটে থাকে, ভালো। বলছিলেন কী না, ভাঙ্চুর করে কি জ্বালা মেটে?'

বসে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ডাইনিং হলের দরজার দিকে, প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে গেল। ধূর্জটি তার হাতের গেলাস টেবিলে রেখে, হাত বাড়িয়ে অমিতার একটা হাত ধরলো। দেখলাম, ধূর্জটির কাতর মুখে, গভীর অসুখের ছায়া নেমেছে যেন। সে অমিতাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিলে প্রায়। অমিতা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে বললো. 'ছাড়ুন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি শুতে যাবো।'

ধূর্জটি বললো, 'এ ঘরেই তোমার শোবার কথা।'

'বেশ্যাকে নিয়ে শোবেন আপনি?'

অমিতার রক্ত চোয়ানো ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চোখ জলে ভাসছে। আবার বললো, 'আপনার উচিত না। ছাড়ুন। চৌকিদার যদি আপনাকে মেয়ে যোগাড় করে দিতে পারে, তবে আমাকেও একটা পুরুষ যোগাড় করে দিতে পারবে। যাতে ওর দেনা মিটিয়ে, ট্রেনের ভাড়া যোগাড় করে, কলকাতায় ফিরে যেতে পারি। ছাড়ুন।'

ধূর্জটির আলিঙ্গন আরো শক্ত হল। অমিতার চোখ বোজা, সে পিছন দিকে হেলে পড়ে, দু' হাত দিতে ধূর্জটির বুকে ঠেলা দিল। ধূর্জটির গলায় নির্দেশ বা আদেশের সুর নেই, কিন্তু একটা দৃঢ়তা বাজলো. 'না, তুমি কোথাও যাবে না, তুমি আমার কাছে থাকবে।'

অমিতা চোখ বুজেই মাথা নাড়তে লাগলো। ধূর্জটি শুনলো না, অমিতাকে বুকের কাছে ধরে, খাটের ওপর এনে বসালো। নিচু হয়ে অমিতার দু পা তুলে দিল খাটের ওপর। বালিশের ওপর মাথা তুলে দিল। অমিতা তখনো মাথা নাড়ছে। তার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। চোখে জল। কিন্তু সে আর উঠতে পারছে না।

এ দৃশ্যও আমার কাছে অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর। ধূর্জটির এ রূপ আমার কখনো দেখা ছিল না। এতক্ষণে সে আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি তার চোখের দিকে দেখলাম। চোখে তার গভীর অন্যমনস্কতা, 'পুকুর ধারে' কবিতা আবৃত্তির কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি কোনো কথা না বলে. আমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

পরের দিন আমার ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। ঘুম ভেঙে একে একে সব কথা মনে পড়তে লাগলো। এখন কী হচ্ছে, কে জানে। পাশের ঘরে যারা আছে, তাদের ঘুম ভেঙেছে কী না, বা তারা কী অবস্থায় আছে, রাত্রে আর নতুন করে কিছু ঘটেছে কী না, কিছুই জানি না। আমার ঘর থেকেও বাথরুমে যাবার একটি দরজা আছে। কোনরকম শব্দ না করে, আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজাটা খুললাম। দেখলাম, কেউ নেই। ধূর্জটির দিকের ঘরের দরজা বন্ধ। আমি নিঃশব্দে এদিক থেকেও তার ঘরের দরজার ছিটকিনি আটকে দিলাম, এবং যতোটা সম্ভব নিঃশব্দেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিলাম। কিন্তু বাথরুমের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমার আগেই যেন বাথরুম ব্যবহৃত হয়েছে।

যাই হোক, আমি দাড়ি কামানো থেকে, একেবারে স্নানাদি শেষ করে

নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে নিলাম। বাংলোর বারান্দায় যাবার দিকের দরজাটা খুলে, বারান্দায় পা দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, ধূর্জটি আর অমিতা পাশাপাশি শোফায় বসে আছে। তাদের সামনে, টেবিলের ওপরে ধূমায়িত চায়ের কাপ। অমিতাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে সদ্যস্নাতা। একটি বাসন্তী রঙের চওড়া লাল পাড় শাড়ি আর বাসন্তী রঙেরই জামা তার গায়ে। কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর। কাঁধের কাছে, খোলা চুলের পাশ দিয়ে অল্প একটু ঘোমটা তোলা রয়েছে মাথায়। যেন এক নতুন অমিতা যাকে আমি চিনি না, দেখিনি কখনো। সে আমার দিকে তাকিয়ে, সলজ্জভাবে অল্প একটু হাসলো। ধূর্জটি পায়জামা পাঞ্জাবি পরে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, তারও স্নানাদি হয়ে গিয়েছে। ডাকলো, 'এসো এসো। অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়েছ।'

আমি তাদের সামনে গেলাম। অমিতার বাঁ চোখটি লাল। গালে এখনো নীল দাগ। ধূর্জটি গলা তুলে ডাকলো, 'বনোয়ারি।'

ডাইনিং হল থেকে বনোয়ারির গলা শোনা গেল, 'হুজোর।'

'সাবকো নাস্তা দো।'

বলে আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তোমাকে আর ডাকিনি, ভাবলাম ঘুমোচ্ছ, ঘুমোও। তা তুমি তো দেখছি, চানটান সেরেই বেরিয়েছ।'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

বনোয়ারি আমার খাবার নিয়ে এল। ডিমের পোচ্, পরোটা আর তরকারি। আমার জন্য চায়ের আলাদা কাপ ডিস ছিল। বড় একটি পট ট্রে-র ওপরে বসানো। অমিতা বললো, 'খান।'

আমি খেতে শুরু করলাম। অমিতা ধূর্জটিকে বললো, 'তোমাকে আর একটু দিই।'

ধূর্জটি বললো, 'দাও।'

অমিতা পট থেকে ধূর্জটির কাপে চা ঢেলে দিল। আমাকে বললো, 'আপনাকে পরে দিচ্ছি। তা নইলে জুড়িয়ে যাবে।'

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। কিন্তু এ দৃশ্যও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল? আর এত বিস্ময়? কিন্তু আমার বলার কিছু নেই। জিজ্ঞাসাও করতে পারি না কিছু, কৌতূহল প্রকাশও সম্ভব না। কিন্তু সমস্ত ছবিটা আমার চোখে যেন ভারি স্নিগ্ধ মনে হল। বিশেষ করে অমিতাকে। তার গালে দাগ, একটি চোখ লাল, কিন্তু তার মুখশ্রী যেন এক নতুন রূপের আলোয় ভরা। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথির উজ্জ্বল সিঁদুর, সবই তাকে শ্রীময়ী করে তুলেছে।

খাবার পরে, সে আমাকে চা ঢেলে, কাপ এগিয়ে দিল। ধূর্জটি সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'ভাবছি আজ দুপুরে খেয়ে দেয়ে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। কয়েকটা দিন দাক্ষিণাত্য ঘুরে, অজন্তা ইলোরা দেখে কলকাতায় ফিরবো।'

বললাম, 'আমি তাহলে এখান থেকেই কলকাতায় ফিরে যাই?'

অমিতা অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন?'

ধূর্জটি আমার দিকে দেখিয়ে বললো, 'ওর কন্ত্রা ছাড়ো। ওকে কি আমি ছাড়ছি নাকি? ও যা ভেবে বলছে, তা আমি জানি। সাহিত্যিক মানুষ, একটু বেশি ভদ্রলোক তো।'

অমিতা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, ধূর্জটিকে বললো 'তা তুমি কি চাও, উনি অভদ্রলোক হবেন?'

'তা তো বলিনি। বলেছি, একটু বেশি ভদ্রলোক। আমাদের দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে উনি কেটে পড়তে চাইছেন, ভাবছেন, তোমার আমার অসুবিধা হতে পারে।'

অমিতা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি না থাকলে মোটে ভালোই লাগবে না। এ লোকের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলা যাবে?'

বলে ধূর্জটির দিকে তাকালো। ধূর্জটিও অমিতার দিকে তাকিয়ে হাসলো, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে এমন গভীর আবেগ আর কখনো দেখিনি। বললো, 'তা ঠিক বলেছ। আমি কথা বলতে চাই না, শুধু দেখতে চাই।'

অমিতার মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। সে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, একটি বারোবধূ আমার সামনে বসে। এ সবই কি মায়াবিনীর খেলা? না কি এর মধ্যে সত্যও কিছু আছে?

ধূর্জটি তখন একটি ভৈরবী টপ্পার সুর গুনগুন করছে।

তারপরে কয়েকটা দিন ধরে, মধ্যভারত থেকে দাক্ষিণাত্য ঘুরে, মহীশূর বেড়িয়ে, কলকাতায় ফিরলাম। তার মধ্যে, অমিতা আর ধূর্জটির মধ্যে আমি সব থেকে যা লক্ষণীয় দেখলাম, তাদের মেলামেশার মধ্যে কোনো আতিশয্য ছিল না। কিন্তু দু'জনের মধ্যেই একটা আবেগের গভীরতা দেখেছি। দু'জনকেই খুব কম মদ্যপান করতে দেখেছি। অমিতা খুবই কম মদ্যপান করে, আমার সামনেই অমিতাকে বলতে শুনেছি, 'মিত্র, তুমি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ? তুমি আবার আমাকে কোথায় ফেলে পালিয়ে যাবে, তাই ভাবছি।'

ধূর্জটি জবাবে বলেছে, 'কে যে কাকে টেনে নিয়ে চলেছে, তা একমাত্র

অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ভয়ে যেন কেমন কেঁপে উঠছে।'

অমিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন গো?'

ধূর্জটি অন্যমনস্ক গম্ভীর স্বরে বলেছে, 'জানি না। শুধু এইটুকু বুঝেছি; জীবনে যেন কী একটা ঘটে গেল।'

'কী ঘটে গেল মিত্র?'

'তাও যে বুঝতে পারছি না অমিতা। কোনো ব্যাখ্যা করতে পারি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, এই সাহিত্যিকের সামনেই বলছি, আমার ভেতরে যে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেল, তা সত্যি, আর তা তোমাকে দেখবার পরেই।'

অমিতা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলেছে, 'না না, অমন করে বলো না। তার চেয়ে তুমি আমাকে আরো দু' ঘা মারো।'

ধূর্জটি বলেছে, 'তোমার কথাটাই এবার একটু ঘুরিয়ে বলি। ভয়ের কথা যে বলছিলাম, আসলে সেটা মারেরই ভয়। এতদিন মেরে এসেছি, এবার আমি কবে মার খাবো, সেই আমার ভয়।'

'তোমাকে কে মারবে?'

'আমার প্রাণ।'

'তোমার প্রাণ তোমাকে মারবে?'

'মারবেই বলছি না, যদি মারে, তবে সে আমারই প্রাণ, সে আমার প্রাণেরই তুল্য।'

বলতে বলতেই সে গুন গুন করে, টপ্পার সুরে গান গেয়ে উঠেছে,

'তুমি তো জানো প্রাণ!
যদি করো আন্
তবে কি রবে এ প্রাণ?'

এ গান যখন সে গেয়েছে, তখন তার করুণ মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি, অমিতার চোখে নিবদ্ধ দেখেছি। অমিতাকেও দেখেছি, সে ধূর্জটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। মনে হয়েছে, তাদের দুজনের চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে কী এক গভীর জানাজানি যেন ঘটছে। সে জানাজানি শুধু তারা-ই জানে। আমি দর্শক আর শ্রোতা মাত্র। তারপরেও ধূর্জটি গেয়েছে,

'তুমি তো জানো প্রাণ
কভু ভজিনি ভগবান
তোমা বই আর কিছু
নাহি জানে এ প্রাণ।'

দেখেছি, আমারই সামনে, অমিতা ধূর্জটির কোলে মুখ চেপে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলে উঠেছে, 'মিত্র, মরে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি।'

ধূর্জটি বলেছে, 'মরছি আমিও। কিন্তু মরণ যে এমন পরম রতন, আগে তা জানিনি।'

অমিতাকে চোখের জলেই হেসে বলতে শুনেছি, 'সহমরণে যাবো নাকি গো।'

ধূর্জটি বলেছে, 'যাবো কী গো। সহমরণ তো ঘটছে।'

আমি যে ধূর্জটি অমিতার সব কথা বুঝেছি, তা বলতে পারবো না। অনেক সময়, তাদের অনেক কথাই আমার কাছে, বাউলের গানের মতোই দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তারা যেন ভিন্ন জগতের লোক, ভিন্ন ভাষায় কথা বলছে। আর আমার কাছে, সমস্ত ব্যাপারটাই বিস্ময়কর বোধ হয়েছে।

কলকাতায় ফিরে আসার পরে, ধূর্জটিকে দেখলাম, সে যেন বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে বিশেষ কাজ সবই আইনঘটিত। সলিসিটরের সঙ্গে কথাবার্তা আলোচনা। সব সময়ে তো আর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারিনি। যতোটুকু দেখেছি, দেখেছি নানান দলিল দস্তাবেজ নিয়ে সে খুব ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট কোনো জবাব পাইনি।

নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেছি। সে আমাকে আজকাল লেখক ঠাকুরপো বলে ডাকে। ভেবেছিলাম, তার মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখবো। কিন্তু কিছুমাত্র না। সে যেমন ছিল, তেমনি আছে। হাসিখুশি, কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে, উজ্জ্বল সম্ভাবনার কল্পনা —কল্পনা বলবো না। দৃঢ় একটা বিশ্বাস নিয়ে চলেছে। নিবেদিতা আমাকে বেশ খুশি মুখেই বলেছে, 'আপনার দাদার মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজের এতদিনের পাই পয়সার হিসেবটিও আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, এখন থেকে উনি আমার পেটভাতা-র লোক। যেখানেই থাকবেন, যেন দুটি খেতে দিই। আচ্ছা বলুন তো, আমার ঘাড়ে এত সব চাপিয়ে দিলে চলে? খোকার আর একটু বড় হওয়া দরকার। উনি এর মধ্যেই সব আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। অবিশ্যি আমি আমার চেষ্টা মতো সবই করবো। ওঁর যা কিছু, সব দেখা আর রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তারপরে উনি নিজে যা ভালো বুঝবেন করবেন। ওঁকে আমার কিছু বোঝাবার নেই।'

এদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ সন্ধ্যা হলেই, অমিতার কাছে চলে যায়। আমাকেও কয়েকবার টেনে নিয়ে গিয়েছে। ধূর্জটিকে আমি আগে কখনো বারোবধূ পল্লীতে যেতে দেখিনি। এখন সে রোজই যায়। আমাকেও কয়েকদিন টেনে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে পরিবেশ বা চিত্র সেখানে দেখবো ভেবেছিলাম,

তার কিছুই দেখিনি। অন্যান্য ঘরের সাজসজ্জা, আলোর ঝলক, হাসির ঝংকার, মাতালের হল্লা, যেমন দেখি, অমিতার ঘরে সেসব কিছুই নেই। ধূর্জটি তার নিজের গাড়িটাও চালিয়ে নিয়ে আসে না। ভাড়া করা ট্যাক্সিতে আসে। মদ্যপান অত্যন্ত পরিমিত। অমিতা তো স্পর্শই করে না।

অমিতা বরং আমাকে অন্য ঘরের আসরে বসিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'কিছু করতে হবে না। একটু দেখুন না, এটাও তো একটা জীবন।'

জীবন তো বটেই। দেহোপজীবিনীকে শ্রদ্ধা করি, অথচ তাদের জীবনকে দিয়ে নিষ্ঠুর উদাহরণ আর প্রতীক ব্যবহার করি, এ জাতীয় শিল্পী-মন আমার একেবারেই নেই। সেখানে, যৌবন বলবো না, যৌনতার এক নিরন্তর লীলাখেলা চলেছে।

অমিতারই এক বান্ধবী, একই বাড়ির অন্য একটি ঘরে থাকে, নাম দুর্গা। সে তো দেখি, আমাকে দাদা বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। দুর্গা আমাকে বলেছে, 'অমিতা একেবারে বদলে গেছে। এখানকার সব পাট চুকিয়ে দিচ্ছে। আর দেখেছেন, দিনকে দিন আরো কেমন সুন্দর হচ্ছে?'

সে কথাও মিথ্যা না। অমিতার মধ্যে যেন এক নতুন সৌন্দর্য ফুটে উঠছে। অথচ, যদি এই পল্লীকে আমি পঙ্ক বলি, তাহলে বলতে হবে, অমিতা পঙ্কজ। এবং অমিতা যে তার এখানকার সব পাট চুকিয়ে দিচ্ছে, তা আমি দিনের পর দিন, চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। সে একে একে তার সব দামী আসবাবপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ ভরি সোনার গহনা, সবই একটা পুঁটুলিতে বেঁধে, আমার সামনেই একদিন ধূর্জটির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলেছে, 'এ কাঁটাগুলোর কী ব্যবস্থা করবে করো, আমি আর রাখতে পারছি না, বড়ো ফুটছে।'

ধূর্জটি বলেছে, 'কেন, তোমাকে তো আমি বৈরাগিনী হতে বলিনি। এগুলো পরতে কী দোষ আছে।'

এখন অমিতাও ধূর্জটির মতো মাঝে মাঝে গানের কলি গুনগুনিয়ে ওঠে। সেই কথার জবাবে, অমিতা নিজের বুকের দিকে তর্জনী দেখিয়ে গুনগুনিয়ে উঠেছে, 'এই মন গরীবের কী দোষ আছে।' তারপরে কথায় বলেছে, 'মন চায় না, তাই পরি না। আমার সব সোনা যে আমার সামনে আছে, আমি যে তাকেই পরেছি। কাঁটা পরবো কেন?'

ধূর্জটি সেই সোনার পুঁটুলির কী ব্যবস্থা করেছে, জানি না। জিজ্ঞেস করিনি, সে নিজেও বলেনি। অন্যদিকে দুর্গা আমাকে বারোবধূ পল্লীর অনেক কিছু দেখিয়েছে। গান শুনিয়েছে, নাচ দেখিয়েছে। ব্যবসায়িক প্রেম চাতুর্যের অনেক খেলা দেখিয়েছে। কতো হাসি কান্না প্রেম বিরহ।

এমন কি, দেহোপজীবিনীর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে, সেখানেই সংসার পেতে বসেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে, আবার ব্যবসাও চলেছে। সারাদিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করছে, পুরুষটির সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করছে, আবার সন্ধ্যে হলেই সেজেগুজে খরিদ্দারকে বুকে নিয়ে ঘরে তুলেছে। যেন সংসার করতে গেলে, যা করতে হয়, এও তেমনিই।

সংসারে আমরা যাদের চরিত্রহীন বলে জানি, শুধু তাদেরই আগমন সেখানে ঘটে না। অনেক নামী দামী ব্যক্তিকেও সেখানে দেখেছি। আগন্তুকদের বয়সের কোনো গাছ-পাথর নেই। গোঁফ-দাড়ি ওঠেনি, এমন ছেলে থেকে, ঘাটের যাত্রীকেও দেখেছি। আর অবাক হয়ে ভেবেছি, জীবন কি বিচিত্র। মনে হয়েছে, মহাকাল তার রথের চাকাটা এখান দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবার সময়, একটু বোধহয় মন্থর করেন। কারণ এখানে মহাকালেরও বোধহয় একটা রিসার্চ লেবরেটরি আছে। কামবিকারের বেদীটা পাশ্চাত্ত্য জগতে কতোখানি বিস্তার লাভ করেছে জানি না, প্রতীচির বেদীটও ছোট না।

যাই হোক, আমার এ অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের সময় এখন না। ধূর্জটি একদিন জানালো, অমিতাকে নিয়ে সে অন্য এক জেলায় চলে যাচ্ছে। গ্রাম বলতে যে বোঝায়, ঠিক সেরকম না হলেও, একেবারে গঞ্জে বাজারেও না। প্রথমটায় সে বলতে চায়নি। পরে, যাবার একেবারে শেষ মুহূর্তে জানিয়ে গেল, সে অমিতাকে নিয়ে কেন্দুলি চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'সারাটা জীবন এভাবে ভোগ করলেন, গাড়ি ছাড়া এক পা চলতে পারেন না, সেখানে গিয়ে থাকবেন কেমন করে? জমিজমা নিয়ে চাষ-আবাদ করবেন নাকি?'

ধূর্জটি বললো, 'চাষ-আবাদই যদি করবো, তাহলে আর কলকাতার লোহা পেট্রল কী দোষ করেছে। তবে হ্যাঁ, জীবনযাপনের জন্য, একটা কোনো জীবিকা তো চাই। নেহাত বোষ্টম-বোষ্টমী হয়ে, ভিক্ষে করে বেড়াতে পারবো না। যদি কখনো ইচ্ছা হয়, একবার যেও। তুমি তো অনেক কিছুরই সাক্ষী।'

ধূর্জটিপ্রসাদের মতো লোককে আমার কিছুই বলার নেই. সে নিজে যা বুঝবে, তা-ই করবে। তবে এটা বুঝেছি. তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে কোনো সন্দেহ নেই, তা প্রশ্নাতীত। অমিতাকে আমি

তেমন করে জানি না। তাকে আমি আকস্মিক দেখেছি, তার পরিবর্তনও তেমনই আকস্মিক। ধূর্জটিকে আমি তার আগে থেকেই দেখেছি, তার মধ্যে সে একজন ভিন্ন মানুষ আছে, তাও বুঝেছিলাম। তথাপি, রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ-এর 'পুকুর ধারে'-এর কথা আমার মনে পড়ে। সেই ছবির সঙ্গে, অমিতাকে কেমন করে মেলানো যায়, আমি জানি না। অবিশ্যি এ-কথা ঠিক, শেষের দিকে যে অমিতাকে দেখেছি, প্রথম দিকের অমিতা সে না, ছিল না আর। রঙ্গিনী রূপের কিছুই ছিল না। কিন্তু, 'আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে/দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।...তখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি/সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না; কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—/চোখ ঝাপসা হয়ে আসে॥' ধূর্জটির সেই আবৃত্তির কথা আমার মনে পড়ে যায়। ভাবি, সেই ছবিই কি সে খুঁজে পেয়েছে অমিতার মধ্যে? এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার জানা নেই।

প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেল। ভেবেছিলাম, জয়দেবের মেলার সময় কেঁদুলি যাবো। ধূর্জটি আর অমিতাকেও দেখে আসবো। কিন্তু নানা কারণে এমন জড়িয়ে গেলাম, কিছুতেই যাওয়া হয়ে উঠলো না। মাসখানেক পরে যখন সময় পেলাম, তখন মাঘ মাসের প্রায় শেষ। কলকাতায় বসন্তের আবহাওয়া এসে গিয়েছে। কলকাতা শহরে গাছপালা তেমন না থাকলেও, পথে পথে এখনো কিছু পাতা ঝরতে দেখা যায়। কিন্তু কলকাতার বাইরে গিয়ে দেখলাম, শীত একেবারে বিদায় নেয়নি। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে অজয়ের ওপরে সেতু হয়নি। তৈরি হচ্ছে মাত্র। দুর্গাপুর দিয়ে যাবো ভেবে, সেখানে গিয়ে শুনলাম, বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া, বাস চলাচল করে না। আগে জানলে ইলামবাজার দিয়েই যেতাম। শেষ পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে, অজয়ের ধার অবধি পৌঁছুনো গেল।

অজয়ের জল খুবই কম, যদিও স্রোত অত্যন্ত তীব্র। তবে মানুষ এবং গরুর গাড়ি সবই পারাপার করছে। আমিও পার হলাম। কিছু খোঁজ খবর করে, কেঁদুলির মূল মন্দিরের পাশে, ডান দিকে, প্রায় অজয়ের কূল ঘেঁষেই একটি কুটিরের সন্ধান পাওয়া গেল। ধূর্জটিপ্রসাদের বাসস্থান। কুটিরের সামনে, ছোটখাটো একটি মুদী দোকান। বড় একটি গাছের ছায়ায় কুটিরটি ঢাকা। পাশে লাউ শিমের মাচা। কিন্তু মুদী দোকানে, সামান্য একটি সুতি কাপড়ের চাদর গায়ে দেওয়া লোকটি যে ধূর্জটিপ্রসাদ, তা একেবারেই বুঝতে পারিনি। তার মাথায় বড় বড় চুল। রঙটা অনেক কালো হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যও বেশ রোগা। দোকানে আরো দু-তিনজন স্থানীয় লোক বসেছিল। সে তাদের সঙ্গেই কথা বলছিল। আমাকে

দেখেই, খুশি গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'আরে এসো এসো সাহিত্যিক। তোমার কথা রোজ মনে পড়ে। ওগো, বাইরে এসো, কে এসেছে দেখবে এসো।'

দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে, একটা সামান্য মিলের লালপাড় শাড়ি পরা, ঘোমটা মাথায় দেওয়া অমিতা বেরিয়ে এল। গায়ে জামা নেই। হাতে খুন্তি, বোধহয় রান্না করছিল। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মাথার ঘোমটার সামনে, স্নানের পরে ভেজা চুল চুড়ো করে রাখা। অমিতাকে তেমন অনুজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। আমাকে দেখেই তার চোখে মুখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ডাকলো, 'এতদিন পরে মনে পড়লো? আসুন আসুন।'

আমি ভিতরে গেলাম। ধূর্জটি প্রায় খেপে গেল। একবার কথা বলে। আর একবার গান করে। আমার সামনেই অমিতাকে জড়িয়ে ধরে, পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখছো বলো তো?'

আমি বলি, 'সুন্দর।'

ভিতরে নিকনো উঠোন। ছোট রান্নাঘর। থাকবার ঘর একটি। কাঁচা মাটির মেঝেতেই শয়নের ব্যবস্থা। আমার কাছে সবই অকল্পিত। ধূর্জটি বললো, 'এই এক ঘরেই আমাদের সঙ্গে তোমাকে থাকতে হবে। কয়েকদিন থেকে তারপর যাবে। একে বলে ধুজাই মুদীর ঘর।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ধুজাই মুদী? সেটা আবার কী?'

'কেন, আমাকে এখানে সবাই যে ধুজাই মুদী বলে।'

হাসবো না কাঁদবো, বুঝতে পারি না। তারপরে কথায় কথায়, অমিতার সামনেই ধূর্জটি বললো, 'অমি আজকাল মাঝে মাঝে খুব রেগে যায়। ওর মাথায় যে কী ঢোকে। সেদিন তো আমাকে একটা কাঠ ছুঁড়েই মারলো। তেমন ভাবে লাগলে, মরেই যেতাম।'

আমি অবাক চোখে অমিতার দিকে তাকাই। অমিতা লজ্জিত হেসে বললো, 'তা মানুষের মন কি সব সময় একরকম থাকে?'

বাংলোর সেই প্রথম রাত্রির কথা আমার মনে পড়ে গেল। অমিতার কথা, তার সেই ভাঙচুর তছনছ করার কথা, এবং 'মানুষের মন সব দিন একরকম থাকে না।' কিন্তু এখনো কি সেই ভূত তার ঘাড়ে চেপে আছে নাকি? আর ধূর্জটি এমন হাসতে হাসতে কথাটা বললো, যেন এমন কিছুই না। আবার বললো, 'মাঝে মাঝে বলি, অমি একটু মদ খা, মনটা সুস্থির হতে পারে। তাও খাবে না। আমি তো খাই-ই না। ওই কেউ কেউ এখানকার বাবাজীরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে একটু গাঁজা খাই। তা আমি টানবো তো, অমিও টানবে।'

বলে ধূর্জটির কী হাসি। কিন্তু আমার মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে

গেল। অমিতা কাঠ ছঁুড়ে মারে ধূর্জটিকে? আর ধূর্জটি তা হেসে আমাকে বলে? তবে আমি যে দুদিন রইলাম, ভালোই লাগলো।

ফিরে আসার পরে নিবেদিতার কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখি না। নিবেদিতাকে একটু গম্ভীর মনে হয়। ছেলেকে নিয়ে একটু মনস্তাপ আছে। ছেলেটি মদ্যপান ধরেছে। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি। প্রতি মাসে সত্যনারায়ণও হয়। ধূর্জটির বড় গাড়িটা তার ছেলে চালিয়ে বেড়ায়। আমার মুখে ধূর্জটির কথা শুনে, নিবেদিতা বললো, 'ওকে আমি কোনোদিনই বুঝিনি। তবে একটা কথা জানি, ওর ভেতরে এমন শক্তি আছে, ও যা মনে করবে, তা-ই করবে। সুখ সুখ করে ওকে কখনো চিৎকার করতে শুনিনি। ও যদি সুখে থাকে, থাক। আমার তো কোনো অভাব রাখেনি।'

এর পরে আর কিছু বলবার নেই।

তারপরে সাত আট মাস ধূর্জটির আর কোনো খবর পাই নি। মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হল। ওদের দেখবার জন্য হঠাৎ একদিন কেঁদুলি চলে গেলাম। এবার অবিশ্যি ভিন্ন পথে গেলাম। কারণ এই ভাদ্রে অজয়ের চেহারা একেবারে রুদ্র। সে যে কখন কী সর্বনাশ করবে, বলা যায় না।

কিন্তু ধূর্জটির কুটিরের সামনে এসে দেখলাম, মুদী দোকান বন্ধ। সমস্ত কুটির নিঃশব্দ। আশেপাশে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখলাম, কারোর কোনো সাড়া শব্দ নেই। সামনে একটি গ্রাম্য লোককে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'এঁরা কোথায়?'

লোকটি বললো, 'ধুজাই বাবার কথা জিগেঁসা কইচ্ছেন? দেখেন যেঁইয়ো, উই গাছতলায় বস্যা আছেন।' বলে, একটু দূরেই সে আমাকে একটি গাছ দেখিয়ে দিল। কাছে গিয়ে দেখি, ধূর্জটি খালি গায়ে বসে আছে। এখন আর শুধু বড় চুল না, বেশ গোঁফ-দাড়িও গজিয়েছে। পরনে সামান্য একটি পাড়হীন থান। দৃষ্টি নিবদ্ধ গর্জমান বহতা অজয়ের দিকে। ডাকলাম, 'ধূর্জটিদা!'

'কে?'

যেন চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকালো। তাকিয়েই দু চোখে হাসি ঝলকে উঠলো। একেবারে গদগদ হয়ে বললো, 'আরে এসো এসো সাহিত্যিক, তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। বসো ভাই, এখানে ঘাসের

ওপরে বসো, তারপরে ঘরে যাচ্ছি।'

আমি ধূর্জটির পাশে বসলাম। আমি কেমন আছি, কী লিখছি, এসব কথা জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু নিজের বাড়ি, স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা জিজ্ঞেস করলো না। অবিশ্যি এর আগের বারেও করেনি। আমি সব কথার জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কেমন আছেন?'

ধূর্জটি অকপট আবদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললো, 'খুবই ভালো ভাই, বেশ ভালো আছি। ভাবছি, কিছুদিনের জন্য বাইরে যাবো।'

'কোথায়?'

'দেখতে।'

'কী দেখতে?'

'এই নদী কোথা হতে আসে, তার উৎস সন্ধানে যাবো। আর কোথায় যায়, তাও দেখতে যাবো। আরো আগেই যেতাম। অমিটার জন্য যাওয়া হচ্ছিল না।'

'উনি কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না?'

'ও কলকাতায় ফিরে গেছে। বড় কষ্ট পেয়েছে, কষ্ট করে, আমাকে যা দেবার, তা দিয়ে, চলে গেছে।'

আমি কিছুক্ষণ একটি কথাও বলতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পরে নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দিয়ে গেছে?'

ধূর্জটি তার চোখে মুখে গোঁফ দাঁড়িতে হাসির লহর তুলে, গুনগুনিয়ে গাইলো,

> 'যে রতন সেজেছে মন
> দিয়েছে সেই সে রতন
> ভোলা মন, সে আমার পরম রতন।'

শুনলাম, কিন্তু কেন যেন চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে চাইছে। ভাবলাম, যদি কোনোদিন ধূর্জটির কথা লিখি, তবে তার নাম দেব 'নব বিল্বমঙ্গল'। তারপরে ধূর্জটি নিজের হাতে রাঁধলো, আমাকে খাওয়ালো। আমার মনে যা-ই হোক, তাকে আমি এত আনন্দ বিভোর দেখলাম, আমার ভিতরে কোন আক্ষেপ বা বিক্ষোভ জাগলো না। সে যেন কিসের একটা ঘোরে মেতে আছে। সে যেন ধূর্জটির মতোই, ত্রৈলোক্যের চিন্তাভারে মগ্ন কিন্তু জ্যোতির্ময়।

কলকাতায় ফিরে এসে, অমিতার খোঁজ করলাম। খোঁজ পেলামও। বারোবধূ পল্লীর সেই বাড়িরই দোতলার একটি ঘরে, সে আবার আসর

সাজিয়ে বসেছে। খাট আলমারি ড্রেসিং টেবল রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, মদের বোতল, গেলাস, সব একেবারে সাজানো গোছানো। সে নিজেও সেইরকম। রঙিগনী বেশে সেজেছে। আমাকে দেখে, ভীষণ খুশী হয়ে হাত ধরে খাটে বসালো। মনে হল, সে একরকমই দেখতে আছে। বললো, 'উহ্, মনে পড়লো?'

বললাম, 'জানতাম না তো। ধূর্জটিদার কাছে শুনলাম, তাই দেখতে এলাম।'

অমিতার মুখ গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো। তারপরে বললো, 'বাবারে কার সঙ্গে কে। আমি কি কখনো পারি, তার মতো লোকের সঙ্গে জীবন কাটাতে? আমি তো আর দক্ষরাজের বেটি নই। আর সে হল নটরাজ। ও আর আমাদের মতো মানুষ নেই।'

ধূর্জটির বিষয় অমিতার কাছ থেকে আমার শুনতে ইচ্ছা করলো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারও তো অনেক পরিবর্তন দেখেছিলাম।'

অমিতা বললো, 'চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না, পালিয়ে এলাম। আমি নিজেকে ভুলতে পারলাম না। আমি যা, আমি তা-ই। হাসবো কাঁদবো নাচবো গাইবো, দশজন নাগর নিয়ে ফুর্তি করবো, আবার ইচ্ছা করলে সব ভেঙেচুরে তছনছ করবো। ওকেও নিজের পথে আনবার চেষ্টা করেছি, তার জন্য তাকে মেরেছি পর্যন্ত।'

বলতে বলতে অমিতার গলা রুদ্ধ হয়ে এসেছে, চোখ জলে ভেসে গেল। কান্নারুদ্ধ গলাতেই বললো, 'কাকে মেরেছি? তার কি সে জ্ঞান ছিল? সে হাসতে হাসতে আমাকেই জড়িয়ে ধরেছে। দেখবেন, আপনারা দেখবেন, আমার এ হাতে কুষ্ঠ হবে, যে হাত দিয়ে ওকে মেরেছি।'

বলে কাঁদতে কাঁদতে, ঘরের মেঝেয় মুখ ঢেকে বসে পড়লো। আমি অমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলাম। আলোকোজ্জ্বল রাস্তায় চলমান জীবনের স্রোত চলেছে।